☐ প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৬০

☐ প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

☐ লেজার : রঘুনাথ প্রেস
৮৩ বি বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

☐ মুদ্রক : ইম্প্রেশন প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
৩০ / ১ ঝাউতলা রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৭

☐ প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

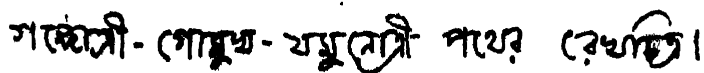
☐ GANGOTRI-GOMUKH
A travelogue in Bengali
By Amalkumar Dam

শিউলি ও গার্গীকে

সূচিপত্র

হরিদ্বারের দেবাঙ্গনে	...	১
কনখল	...	৬
ঋষিকেশ	...	১১
নরেন্দ্রনগর-চাম্বা-টেহ্‌রী	...	১৭
উত্তরকাশী	...	২১
উত্তরকাশী ছাড়িয়ে	...	৩০
গঙ্গোত্রীর পথে	...	৩৩
গঙ্গোত্রীর পুণ্যভূমিতে	...	৩৯
গঙ্গোত্রী ছাড়িয়ে	...	৪৬
চিরবাসা হয়ে ভোজবাসা	...	৫৩
ভোজবাসা	...	৫৮
গঙ্গার উৎসমুখ : গোমুখ	...	৬৩
গোমুখ থেকে ফেরার পথে	...	৭১
আবার গঙ্গোত্রী	...	৭৪

সপ্তর্ষি কুণ্ড
যমুনোত্রী
জানকি চটি
হনুমান চটি
সায়না চটি
আগোড়া
গাংগোরি
উত্তরকাশী
মাতোলি
বারকোট
ধরাসু
হরসিল
লংকা
ভৈরবঘাটি
গঙ্গোত্রী
গোমুখ
ভোজবাসা
নন্দনবন
তপোবন
কেদারতাল
সুখি
গাংনানি
ভাটোয়ারি
কেম্পটি
নাগটিব্বা
সুরখণ্ডা দেবী
টেহরি
তিলওয়াড়া / রুদ্রপ্রয়াগ
শ্রীনগর / দেবপ্রয়াগ
মুসৌরি
চাম্বা
দেরাদুন
নরেন্দ্রনগর
ঋষিকেশ
দেবপ্রয়াগ
হরিদ্বার
—— পাকা রাস্তা
- - - কাঁচা সড়ক



দুর্গা

লক্ষ্মী

গঙ্গা

গণেশ

সরস্বতী

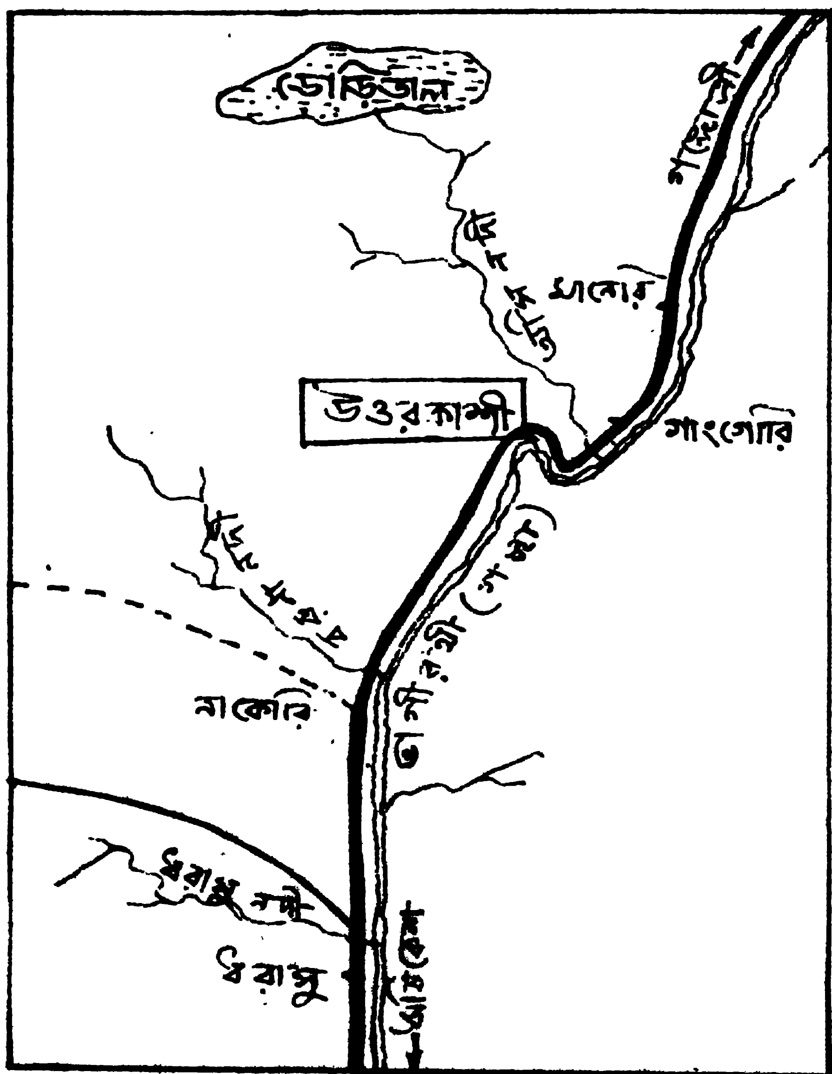
অন্নপূর্ণা

যমুনা

জাহ্নবী

ভগীরথ

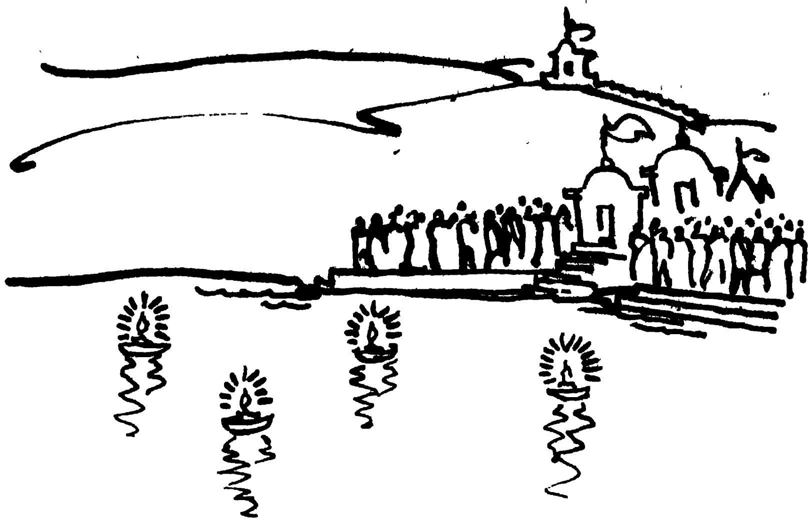
গঙ্গোত্রীতে গঙ্গা-মন্দিরে দেব-দেবীর অবস্থান চিত্র।


ডোডিতাল
মানেরি
উত্তরকাশী
গাংগোরি
ভাগীরথী (গঙ্গা)
নাকোরি
ধরাসু নদী
ধরাসু

গঙ্গোত্রী-গোমুখ-কেদারনাথ-বদ্রীনাথের অবস্থান দেখানো রেখাচিত্র

(আনুপাতিক হারে নয়)

গঙ্গোত্রী
ভাগীরথী (গঙ্গা)
গোমুখ
নন্দন কানন
ভগীরথ পর্বত
ভৃগুপন্থ
শিবলিঙ্গ পর্বত
মেরু
কীর্তি হিমবাহ
শতোপন্থ
কেদারনাথ শৃঙ্গ
সুমেরু পর্বত
চৌখাম্বা শৃঙ্গ
শতোপন্থ হিমবাহ
অলকানন্দা
মানা
কেদারনাথ
বদ্রীনাথ
অলকানন্দা



হরিদ্বারের দেবাঙ্গনে

হিমালয় আবার ডাক পাঠালো।

হিমালয়ের দেবালয়ে প্রবেশ করতে হলে প্রথমেই এসে দাঁড়াতে হয় হরিদ্বারে। এই দ্বার অতিক্রম করলেই নগাধিরাজ হিমালয়ের উদার আহ্বান।

শিবালিক পর্বতমালার সানুদেশে মাত্র ৯৬৫ ফুট উচ্চতায় গঙ্গার ডান তীরে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ। প্রতি বারো বছর অন্তর কুম্ভমেলা এবং ছ'বছর অন্তর অর্ধকুম্ভমেলায় তো কথাই নেই, সারা বছরই যাত্রী ও ভক্ত সমাবেশ এখানে লেগেই আছে।

হরিদ্বারে থাকার জায়গার অভাব নেই। মধ্যবিত্তদের জন্য আছে প্রচুর হোটেল এবং সাধারণ যাত্রীদের জন্য দু'ডজনের উপর ধর্মশালা। এছাড়াও রয়েছে অনেক বাংলো এবং হলিডে হোম।

আরো দশজনের মতো হোটেলে কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হয়েই বার হলাম গঙ্গাস্নানের জন্য। জল কনকনে ঠাণ্ডা এবং স্রোত প্রবল। সারা ঘাট জুড়ে কিছু দূরে দূরে শিকল বাঁধা রয়েছে। প্রবল স্রোতের টান থেকে বাঁচার জন্য শিকল ধরে যাতে ডুব দেওয়া যায়। জল দারুণ রকমের ঠাণ্ডা হলেও স্নান করতে নেমে চট্ করে কেউ উঠতে চায় না। শিউলি আর গার্গী দাপাদাপি করছে। ঐ স্রোতের মধ্যেও কয়েকজন নওজোয়ান সাঁতার কেটে চলেছে। ছেলে-ছোকরার দল ঝাঁপ দিচ্ছে ওপাশের ব্রিজের উপর থেকে।

স্নান সেরে ওঠার মুখেই শিউলির হাতের গামছা জলের তোড়ে ভেসে বার হয়ে গেল। শিউলি বলে উঠল—'মা গঙ্গা! তোমাকে গামছা দিলাম।' পাশে যে প্রবীণা মহিলা স্নান করছিলেন, তিনি সকৌতুকে বললেন 'মা গঙ্গাকে লোকে হীরে-জহরৎ, সোনা-দানা দিয়ে থাকে, তুমি একটা পুরোনো গামছা দিলে বাছা!'

তখন জানতাম না, এই কৌতুক কতখানি বাস্তব হয়ে দেখা দেবে।

গতবারে দাদা-বৌদির হোটেলে খাওয়া হয়ে ওঠেনি। বন্ধুরা বলছিল—'সে কি! বঙ্গসন্তান হয়ে দাদা-বৌদির হোটেলে খাওনি!' ওদের কথা শুনে মনে হয়েছিল নেহাৎ একটা অপরাধই করে ফেলেছি। এবারে তাই গঙ্গা স্নানের পরই দুপুরের খাওয়া সারলাম দাদা-বৌদির হোটেলে। সরু চালের ভাত, ঘি, শুক্তো, ধোঁকার ডালনা, ডাল, পাঁপড় আর চাটনি।

দুপুরে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর মনসা-মন্দিরের জন্য রওনা হলাম। হরিদ্বারে দুটি পাহাড়। একটি গঙ্গার ওপারে নীলপর্বত, যার শীর্ষে চণ্ডীমন্দির। মন্দিরের পাদদেশ পর্যন্ত গাড়ি যেতে পারে, কিন্তু তারপরে পাহাড়ে পায়ে হাঁটা পথ। দ্বিতীয়টি এপারে বিল্ব পর্বত, যার মাথায় মনসা মন্দির অর্থাৎ এখন আমরা যেখানে চলেছি। এখানেও পায়ে-হাঁটা পথ আছে। অনেকে পায়ে হেঁটে উঠলেও আমাদের মতো বেশির ভাগ যাত্রী রোপওয়ে পছন্দ করে থাকে।

ঘাটের দিকে যেতে মূল সড়ক থেকে বাঁহাতে একটু এগিয়েই 'রতন' সিনেমার পাশ দিয়ে রোপওয়ে উঠে গেছে। যাত্রা-দূরত্ব মাত্র ৬০০ মিটার অর্থাৎ হাজার দুয়েক ফুট এবং নীচে যেখানে চাপছি এবং উপরে যেখানে নামব এই দুই জায়গায় আনুভূমিক পার্থক্য মাত্র ১৪৫ মিটার (৪৭৫ ফুট)। উচ্চতা বেশি না হলেও পাহাড়ের ঢাল বরাবর তারের উপর থেকে ঝুলতে ঝুলতে নিরাপদ বসার জায়গায় জমিয়ে বসে চারিদিক দেখতে দেখতে যেতে বেশ লাগে। চলতি অবস্থাতেই বাইরের ছবি তোলা হলো। একটা তার বেয়ে আমরা উঠছি এবং ডাউন-লেনের তার বেয়ে নীচে নামছে ফিরতি-পথের যাত্রীদল। পুতুলের মতো মিষ্টি একটা মেয়ে তার বাবার কোলে চেপে নামছে; আমাদের উদ্দেশে হাত নাড়ল—টা-টা।

যেখান নামলাম সেখান থেকে বার হয়ে কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে একটু উপরে উঠতেই মন্দির চত্বর। পাশেই বাচ্চাদের মাথায় চুল কামানো হচ্ছে—মানত রক্ষার্থে। ডান হাতে বৈষ্ণবী দেবীর মন্দির। গড়ুরাসীনা চতুর্ভুজা মর্মর মূর্তি।

এখনও রোদ নরম হয়নি এবং সেজন্যই হয়তো মনসা-মন্দিরে তেমন একটা ভীড় নেই। সমাগম বেশি হয় আরো ঘণ্টাখানেক পর থেকে।

মনসা মন্দির। গঙ্গার দিকে মুখ করে সাদা মর্মরের ত্রিআননা চতুর্ভুজা মূর্তি।

প্রদক্ষিণ করে বার হয়ে এলাম। গর্ভগৃহের বাইরের দেয়াল-প্রকোষ্ঠে নানা দেব-দেবীমূর্তি।

এখনই নিচে নামার তাড়া নেই। বিল্ব পর্বতের মাথায় দাঁড়িয়ে আছি। উপর থেকে নিচে গঙ্গা ও তার আশেপাশের সামগ্রিক শোভা অপূর্ব। গঙ্গার ওপারে একটু দূরে নীল পর্বত চোখে পড়ছে। নিচে গঙ্গা, তার উপর বাঁধ; ঘাট ও তার লাগোয়া প্রবাহ, নানা মন্দির, একাধিক ছোট বড় সেতু, দূরে ঋষিকেশ যাওয়ার রাস্তায় গাড়ির চলাচল—সবকিছু মিলিয়ে ছবির মতো সুন্দর।

রোদের তেজ কমতে গঙ্গার ঘাটে নেমে এলাম। চলতি বুলিতে হর-কি-পাউরি ঘাট। আদতে কথাটা হরি-কি-পাউরি। 'পাউরি' মানে পায়ের ছাপ—চরণচিহ্ন। হর—অর্থাৎ মহাদেবের নয়, এখানে আছে শ্রীহরির পায়ের ছাপ। হরিচরণ মন্দিরে শ্রীহরির পায়ের ছাপ দেখলাম। আমরা সকলেই জানি পাথরের বুকে ওরকমভাবে পায়ের ছাপ পড়তে পারে না, তবুও লক্ষ-কোটি মানুষ সরল মনে সেই বিশ্বাস আঁকড়ে আছে। প্রণাম করছে, পুজো দিচ্ছে। এই আন্তরিক বিশ্বাসই আসমুদ্র হিমাচল ভারতের মানুষকে যুগ-যুগান্ত ধরে এখানে আকর্ষণ করে আনছে। কবির কথা একটু বদল করে বললে—রাজা আসে যায়, রাণী আসে যায়, লালজামা গায় নীলজামা গায়, রাজা বদলায় রাণী বদলায়—বিশ্বাস বদলায় না।

গঙ্গার ঘাটে নানা মন্দির। মূল আকর্ষণ অবশ্যই গঙ্গা-মন্দির, কিন্তু কোন মন্দিরটা মূল মন্দির? এখানে রয়েছে আদি-সনাতন গঙ্গা-ভগীরথ মন্দির, পুণ্যপ্রবাহের মাঝখানে ষোড়শ শতকে অম্বরের মির্জা রাজা জয়সিংহের তৈরি প্রাচীন শ্রীগঙ্গা মন্দির, পৌরাণিক শ্রীগঙ্গা মন্দির, মুখ্য শ্রীগঙ্গা মন্দির এবং মহিলা-ঘাটের লাগোয়া শ্রীগঙ্গা মন্দির। আগামীকাল সকালে কোন মন্দিরে পুজো দেব? একই ঘাটে এছাড়াও আছে বদ্রীনারায়ণ মন্দির, সত্যনারায়ণ মন্দির, শিবমন্দির, বাল্মিকী মন্দির, হনুমান মন্দির, সূর্যনারায়ণ মন্দির এবং অবশ্যই হরিচরণ মন্দির—যেখানে শ্রীহরির পায়ের ছাপ রয়েছে।

আমরা সন্ধ্যাবেলার নয়ন মনোহর গঙ্গারতি দেখতে এসেছি। সুবিধামতো জায়গায় বসতে পারলে মিলিত-আরতির সামগ্রিক রূপ দেখা যাবে। রাজা বিড়লা টাওয়ার ঘাটে ভাল জায়গা পেলাম। আমরা বসে আছি গঙ্গার জলে পা ডুবিয়ে। কনকনে ঠাণ্ডা জল, তবুও বেশ ভাল লাগছে।

সাতটা কুড়ির পড়ন্ত বিকেল। এখনও মহিলা-পুরুষ-বাচ্চার দল প্রবল উৎসাহে কনকনে জলে স্নান করে চলেছে। ৭০/৭৫ বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থেকে ৪/৫ বছরের

শিশু। এমনকি একটা বছর দেড়-দুই কচি বাচ্চাকেও তার বাবার কোলে স্নান করতে দেখলাম। অসময়ে, খোলা জায়গায় এবং দারুণ রকমের ঠাণ্ডা জলে! আমরা তো ভাবতেই পারি না। বিশ্বাসের আন্তরিকতাই বোধহয় এদের ভরসা দেয়।

এখনও নামেনি আঁধার, এখনও রয়েছে আলো। ঘাটের দুদিকেই, ব্রিজের উপরে, ব্রিজ থেকে নামার সিঁড়ি, সব—সব জায়গায় হাজার হাজার লোক সমবেত হয়েছেন গঙ্গারতি দেখার জন্য। কোথাও তিলধারণেব জায়গা নেই। এত গাদাগাদি সমাবেশেও কোন গণ্ডগোল, ধাক্কাধাক্কি, মন-কষাকষি, কথা-কাটাকাটি কিছুই নেই। সকলের মনেই যেন সহিষ্ণু-প্রশান্তি।

এর মধ্যেই গঙ্গার বুকে প্রদীপ ভাসানো শুরু হয়ে গেছে। প্রদীপ না বলে প্রদীপ-নৌকা বলাই সঙ্গত। বড় বড় পাতা দিয়ে নৌকার মতো তৈরি করে তার মধ্যে ফুল ভরা হয়েছে; তারই মাঝে ছোট প্রদীপ। প্রদীপে তেল মাখানো সলতে এবং কর্পূর। ছোট-বড় মাঝারি নানা আকারের।

সন্ধ্যার আঁধার তার ছায়া ছড়াতে শুরু করেছে। গঙ্গার বুকে ভেসে চলেছে সারি সারি প্রদীপ। প্রদীপ-শিখা হাওয়াতে কাঁপছে। জলের বুকে তার চলন্ত প্রতিবিম্ব। আমরাও ভাসাব, তবে আরতি হয়ে যাওয়ার পরে।

ঠিক সন্ধে সাতটা-চল্লিশে সমবেত-আরতি শুরু হলো। আগে থেকেই ক্যাসেটে প্রচলিত আরতি-সঙ্গীত বাজছিল। আরতি শুরু হতেই গান বন্ধ হয়ে কাঁসর ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনি আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিল। বড়-ছোট প্রত্যেক মন্দির-পূজারি ঘাটে নেমে এসেছেন এবং এমাথা থেকে মহিলা-ঘাটের ওমাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে প্রায় জনাকুড়ি পূজারি একই তালে একই ছন্দে গঙ্গামায়ের আরতি করে চলেছেন। পঞ্চ-প্রদীপ নয়, বিরাট আধারে কর্পূরের পঞ্চদশ প্রদীপ। বিভিন্ন ছন্দে প্রদীপ নাচিয়ে আরতি হচ্ছে। অভ্যস্থ হাতের লীলায়িত ভঙ্গীতে উঠছে-নামছে। গঙ্গার জলে প্রদীপ শিখার ছায়া হাসছে, খেলছে, নাচছে। মিনিট পনেরোর আরতি মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখলাম হাজার-হাজার যাত্রী ও ভক্তের দল।

এবার আমাদের প্রদীপ ভাসানোর পালা। সকলের মঙ্গল-কামনায় একে-একে প্রদীপ ভাসিয়ে দিলাম। মঙ্গল-বারতা নিয়ে আমাদের ভাসানো প্রদীপ সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আকাশে তখন সপ্তমী চাঁদের হাসি।

খুব সকালে শুচিস্নাত না হয়ে কোনো দেবদেবীর পুজো দিতে মন থেকে সাড়া পাওয়া যায় না। ট্রেন খুব লেট করার জন্য গতকাল পুজো দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

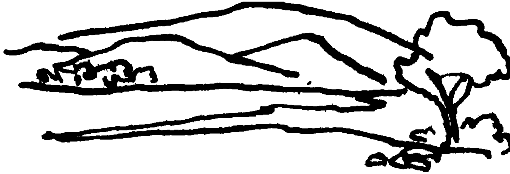
সকাল-সকাল হরি-কি-পাউরি ঘাটে চলে এলাম। এখানে দশজনে হর-কি-প'উরি বলে বলুন, আমি হরি-কি-পাউরি বলব। এঁরা 'হরদোয়ার' বলে বলুন, আমার কাছে—আরো দশজন বাঙালির মতো, পুণ্যতীর্থটির নাম হরিদ্বার।

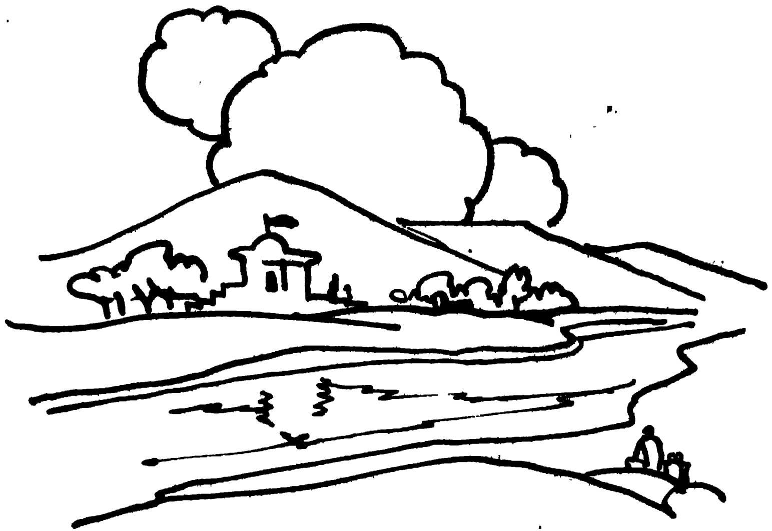
হাতে পুজোর ডালি দেখেই পূজারি-পাণ্ডার দল এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁদের এড়িয়ে নিজেরাই মন্দিরে এলাম। পূজারি নিজের হাতে ডালি নিলেন না। তবে তিনি অন বিহাফ অব হার ম্যাজেস্টি গঙ্গামাঈ, পাপী-দর্শনার্থীদের উদ্ধার করার জন্য অভ্যাসমতো ক্ষিপ্রগতিতে হাতের তালুতে চরণামৃত ছোঁয়াচ্ছেন এবং কপালে টিকা এঁকে দিচ্ছেন। অগত্যা আমরা নিজেরাই মা-গঙ্গার উদ্দেশে ডালি নিবেদন করে আমাদের মনস্কামনা জানালাম।

ঘাটের অন্যান্য মন্দিরেও গেলাম। পাণ্ডাদের কোনো জুলুম নেই এবং বিভিন্ন মন্দির সমেত সারা চত্বরটি সামগ্রিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠার প্রশংসা করতেই হয়। স্বেচ্ছাসেবকের দল রসিদ-বই হাতে ঘুরে ঘুরে যাত্রীদের কাছে সাহায্যের আবেদন রাখছেন। সংগৃহীত অর্থ খরচ হয় গঙ্গারতি কিংবা দরিদ্র-নারায়ণ সেবার জন্য।

হরিদ্বার পৌরাণিক কাল থেকেই পুণ্য তীর্থক্ষেত্র। দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রবেশদ্বার। পাহাড়ি-পরিক্রমা শেষে এখানেই গঙ্গা সমতল ভূমিতে নেমে এসেছে। এককালে স্থানটি গঙ্গাদ্বার নামেও পরিচিত ছিল। সারা বছরই এখানে যাত্রী সমাগম লেগে আছে, তবে বিশেষ সমাবেশ হয় গঙ্গা-দশহরার সময়,—অর্থাৎ যে পুণ্যদিবসে গঙ্গা মর্ত্যে অবতরণ করেছিলেন। পঞ্জিকানুসারে এবছরে সেই দিনটি আগামী পরশু। সেদিন আমরা গঙ্গোত্রীতে থাকব।

এবারে হিমালয়ের আহ্বান সেজন্যই।





কনখল

কনখল হরিদ্বারেরই ওপাড়া। বাস, রিক্সা, টাঙ্গা বা অটোতে যাওয়া যায়। কনখলের প্রধান আকর্ষণ দক্ষ-মহাদেব মন্দির ও মা আনন্দময়ীর মন্দির। এখানে সন্ধ্যার মুখেই আসতে ভাল লাগে, কিন্তু শিউলির ইচ্ছে আজ আবার সন্ধ্যারতি দেখবে এবং মতি-মার্কেটে গার্গীর কিছু কেনাকাটা আছে। আগামীকাল তা সম্ভব নয় কেন না বুধবারে এখানকার দোকানপাট বন্ধ থাকে।

শান্ত পরিবেশে দক্ষ-মহাদেব মন্দির। এখন তেমন জন-সমাগম নেই। নেই গজিয়ে ওঠা অস্থায়ী দোকানে দোকানীদের হৈ-চৈ। বাইরে বাঁদিকে গাড়ি রেখে এগিয়ে গেলাম।

অনেককাল আগের কথা। সেই দেবতাদের যুগের কাহিনী। সমস্ত দেবতাদের উপস্থিতিতে এক বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান হচ্ছিল। প্রজাপতি দক্ষ উপস্থিত হলে ব্রহ্মা এবং মহাদেব ছাড়া সকল দেবতাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন। দক্ষ ব্রহ্মার মানসপুত্র, অতএব তাঁর কথা আলাদা, কিন্তু অন্যান্য দেবতাবৃন্দ উঠে দাঁড়াতে পারলেন অথচ জামাতা হয়েও মহাদেব সেই সম্মান দেখালেন না! ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষ শিবকে ভর্ৎসনা করেন এবং অভিসম্পাত দেন। দেবাদিদেব মহাদেব কিন্তু উদাসীন—নির্বিকার।

প্রজাপতি দক্ষ অপমানের কথা ভুলতে পারলেন না। ব্রহ্মা যখন দক্ষকে সব

প্রজাপতির উপরে স্থান দিলেন, তখন নিজের অধিকারের প্রতিষ্ঠা জানান দিতে বৃহস্পতি নামে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করলেন। সব দেবতাদের আমন্ত্রণ জানানো হলো—মহাদেবকে বাদ দিয়ে। শিবহীন যজ্ঞ না করার জন্য দক্ষকে বারবার অনুরোধ করলেন স্বয়ং ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু। কিন্তু দক্ষ অনড়। কনখলের এই জায়গায় পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে আয়োজিত হয়েছিল সেই যজ্ঞ। সেদিনের যজ্ঞস্থল থেকে গঙ্গা আজ অনেকদূরে সরে গিয়েছে। পাশে তার শুধু এক অংশ বিদ্যমান।

মন্দিরে প্রবেশ করতেই সামনে চিহ্নিত যজ্ঞস্থল, পেছনে সতীর মূর্তি। চিহ্নিত স্থানের সামনে আমরা কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছি নীরবে। অথচ সেদিন এই যজ্ঞস্থল নানা দেবদেবীর সমাগমে ছিল মুখরিত। ওদিকে কৈলাশে তখন মহাদেবের কাছে সতী আবদার ধরেছেন কনখলে যাওয়ার জন্য। বিনা আমন্ত্রণে শিব সতীকে যেতে নিষেধ করলেন। নাই বা হয়েছে আমন্ত্রণ। বাবার কাছে যেতে আমন্ত্রণের দরকার হয় নাকি! শিব তবুও মত দিলেন না। কিন্তু সতী যাবেনই। স্বামী দেবাদিদেব ঠিকই, কিন্তু তিনিও তো মহাশক্তির আধার। দশ মহাবিদ্যার রূপ ধারণ করে প্রকাশিত হলেন। মহাদেবকে অনিচ্ছায় মত দিতে হলো; তবুও তিনি আর একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন যে কাজটা ভাল হচ্ছে না।

সতী যখন পিত্রালয়ের জন্য রওনা হলেন, তখন কি তাঁর বাঁ চোখের পাতা কেঁপে উঠেছিল? সতী যখন যজ্ঞস্থলে এলেন, তখন পিতৃস্নেহে দক্ষের অন্তর ভরে ওঠেনি কেন? কেন তিনি অমার্জিতের মতো সর্বসমক্ষে অশালীনভাবে শিব-নিন্দা করে কন্যার বুকে শেলাঘাত করলেন? অন্তরে প্রতিহিংসা পুষে রাখা এবং সংযম বিসর্জন দিয়ে নীচমনের পরিচয় দিলে কি তাকে ঋষি বলে মেনে নেওয়া যায়?

প্রথমে সতী দুহাতে দুকান ঢাকা দিয়ে ভূমিতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লেন। আশ্চর্য! দক্ষের মনে কোনো প্রভাব পড়ল না। এই অবস্থার চাইতে তাঁর মনে অবহেলিত হওয়ার জ্বালা তখনও বেশি প্রকট। পতি-নিন্দা চরমে উঠলে সতী আর সহ্য করতে পারলেন না। দশজনের সমক্ষে একজন মানীর প্রতি এই অমার্জিত কটূক্তি, এই চরম নিন্দা, এই অশালীন উদ্গার তো তাঁর মৃত্যুরই সমান। এবং স্বামীর মৃত্যু হলে আর জীবনধারণ কেন? সহ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত তিনি পৌঁছেছিলেন, কিন্তু আর পারলেন না। ওখানেই দেহত্যাগ করলেন।

সতীর সাথে যারা এসেছিল, তারা কৈলাশে খবর পাঠাল। জ্বলে উঠলেন মহাদেব। অনুচরদের সাথে বীরভদ্রকে কৈলাশে পাঠালেন। গতপ্রাণা মাতৃসমা সতীকে দেখে তারা আর নিজেদের নিবৃত্ত করতে পারল না। আরম্ভ হলো লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। যারা বাধা দিতে এসেছিল তাদের অনেকেই প্রাণত্যাগ করল এবং অনেক দেবতা আহত

হলেন। শুধু যজ্ঞনাশই হলো না, দক্ষের ধড় থেকে মুণ্ড আলাদা করে যজ্ঞের আগুনে ভস্ম করা হলো। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কৈলাশে ছুটে এলেন মহাদেবের ক্রোধানল শান্ত করার জন্য। মহাদেব এলেন—তাঁর অনুচরদের নিবৃত্ত করলেন। যজ্ঞ অসমাপ্ত রাখা যায় না। কিন্তু দক্ষের মুণ্ড যে ভস্ম হয়ে গেছে—যজ্ঞ সমাপন হবে কেমন করে? মহাদেবই উপায় বাৎলালেন। তাঁর নির্দেশে ব্রহ্মা একটি ছাগের মুণ্ড কেটে দক্ষের শিরস্থানে যুক্ত করে দিলেন। মুণ্ডহীন দক্ষের ধড়ে স্থান পেল ছাগমুণ্ড। তখন থেকে তিনি অজানন দক্ষ নামে পরিচিত। যজ্ঞ সমাপ্ত হলো।

শিউলি বলল—'ব্রহ্মা যে এত বড় সার্জেন ছিলেন তা' তো জানতাম না।'

গার্গী বলল, সুকুমার রায় যা' বলেন বলুন না কেন, আমি তো জানতাম গোঁফ নয়—মুখমণ্ডল দিয়ে যায় চেনা। কিন্তু সেকালে বোধহয় 'মাথার' গুরুত্ব ছিল না, 'ধড়' দিয়েই যেত চেনা।'

এক সহযাত্রী বললেন—'দেব-দেবতার কথা অমৃত-সমান, তাঁহাদের কাহিনীতে থেক আস্থাবান।'

কিন্তু মহাদেবের মন তো তখনও অশান্ত উত্তাল। গতপ্রাণা সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব-নৃত্যে মেতে উঠলেন তিনি। জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে উঠল। মহাদেবকে নিরত করতে না পারলে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। এবং নিরত করা তখনই সম্ভব হবে, যখন সতীর দেহ মহাদেবের দৃষ্টির বাইরে থাকবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর হাত থেকে সুদর্শন চক্র মুক্ত হলো। সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে ভূ-ভারতের ৫১টি স্থানে ছড়িয়ে পড়ল এবং সেই ৫১টি স্থানে গড়ে উঠল ৫১টি পীঠস্থান।

যজ্ঞস্থল ও সতীর দেহত্যাগের স্থান চিহ্নিত আছে। লক্ষ-কোটি মানুষের বিশ্বাসী-মন তা' মেনে নিয়েছে এবং এখানে আসছে যুগ-যুগান্ত ধরে। পাশের কক্ষের মাঝখানে শিবলিঙ্গ—দক্ষেশ্বর মহাদেব।

কনখলে দক্ষযজ্ঞে আসার আগে দশমহাবিদ্যার রূপধারণ করে সতী মহাদেবের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দক্ষেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পাশেই দশমহাবিদ্যা মন্দির। ওখানে এক সেবকের অসাধুজনিত ব্যবহার পীড়িত করল, তাই ওখান থেকে তাড়াতাড়ি বার হয়ে এলাম। মনটা ভাল হলো কাছেই মা আনন্দময়ীর আশ্রমের স্নিগ্ধ-শান্ত পরিবেশ এসে।

সাদা মর্মরের উঁচু শিখরযুক্ত মন্দির। বিরাট হলঘরের একদিকে মা আনন্দময়ীর কল্যাণীমূর্তি। সামনে ধূপধূনো জ্বলছে। দেয়ালে চিত্র মাধ্যমে মায়ের জীবনকাহিনী।

কনখল থেকে ফিরে, হোটেল হয়ে আবার গঙ্গার ঘাটে এলাম। অবশ্যই মন্দির হয়ে। শিউলির এত ভক্তি জানা ছিল না। শ্রীহরির পায়ের ছাপে প্রণাম জানিয়ে মহিলা ঘাটের পাশের ব্রিজ পেরিয়ে রাজা বিড়লা টাওয়ার ঘাটে যেতে গিয়ে গার্গী দাঁড়িয়ে গেল।

—'কি হলো থামলি কেন?'

গার্গী দূরে গঙ্গার মূলপ্রবাহের দিকে তাকিয়েছিল। বলল— 'একটা কথা কিছুক্ষণ ধরেই ভাবছি। বুঝতে পারছি না কথাটা ঠিক কি না?'

শিউলি বলল—'ভূমিকা না করে বলেই ফেল না।'

—'বলছি। গতকাল বিল্ব পর্বতের উপরে মনসা মন্দির থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে গঙ্গার যে সামগ্রিক ছবি দেখেছিলাম, তাতে ধারণা হয়েছিল, হরি-কি-পাউরি ঘাটের এই প্রবাহ মূল প্রবাহ নয়। মনে হয়েছিল একটি কৃত্রিম ধারা এদিকে নিয়ে আসা হয়েছে পুণ্যার্থীদের সুবিধার দিকে নজর রেখে। কিন্তু আজ—'

শিউলি বলল—'ঠিকই তো মনে হয়েছে। ঘাটের এই ধারাটি তো মূল নদী থেকে টেনে আনা একটা কৃত্রিম খালের মতো। তাই না গো?'

আমি বললাম—'সেরকমই তো জানতাম। কিন্তু গার্গীর বোধহয় আলাদা কিছু ধারণা হচ্ছে। ওর কথা শোনা যাক—'

গার্গী বোধহয় একটু সঙ্কুচিত হলো। তারপর বলল —'এটা কৃত্রিম প্রবাহ ঠিকই, কিন্তু আমার মনে হলো, মানে বিড়লা টাওয়ার ঘাটে নামার মুখে এই সেতুর উপরে দাঁড়িয়ে একটু অন্যকথা মনে হলো—।' আমরা তখন সিঁড়ি ভেঙে ঘাটে নামতে শুরু করেছি। গার্গী বলে চলল— 'এটাই স্বাভাবিক যে, এখন যেখানে মন্দির-সারি, তার গায়েই ছিল গঙ্গার ধারা। —ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গার তীরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মন্দিররাজি। তারপর কালের প্রবাহে মূলধারা সরে গেল—কনখলে যেমন দেখলাম। কিন্তু গঙ্গামায়ের মন্দিরের তো একটা ঐতিহ্য আছে! এবং তাই হয়তো সরে-যাওয়া মূল প্রবাহ থেকে একটা ধারা নতুনভাবে কেটে নিয়ে আসা হলো। নতুনভাবে সাজল গঙ্গার ঘাট এবং পরিপার্শ্বিক। এরকম হওয়াই কি স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না?'

তাই তো! নোটবুকে কথাগুলো লিখে রাখতে হচ্ছে। পরে মেজদাকে খুঁচিয়ে জেনে নিতে হবে।

রাজা বিড়লা টাওয়ার ঘাটে বহু যাত্রীর সমাবেশ। স্নানে নেমেছেন প্রবীণ-প্রবীণা, ছেলে-মেয়ে, বৌ-বাচ্চা ও কচি শিশুর দল। কেউ বাদ নেই। শিকল ধরে জলে

নেমেই শিউলির অভিব্যক্তি—"হিঃ হিঃ হিঃ। কি ঠাণ্ডা, জল রে বাবা!" গার্গীর সংযোগ—'শুধু ঠাণ্ডা নয় বৌদি, নিদারুণ ঠাণ্ডা। উ-হু-হু-হু।'

মহিলাদের জন্য আলাদা একটা ঘাট আছে বটে তবে বেশির ভাগ মহিলাই এখানে একসাথেই স্নান করছেন। দেহাতি-রক্ষণশীলা মহিলার দলই মহিলাঘাটে স্নান করেন। এখানে একসাথে মহিলা-পুরুষদের স্নানে কোনো অস্বস্তি বা তথাকথিত পর্দানসীনতায় ছুৎমার্গ নেই। এরই মাঝে ছবি তোলা হচ্ছে।

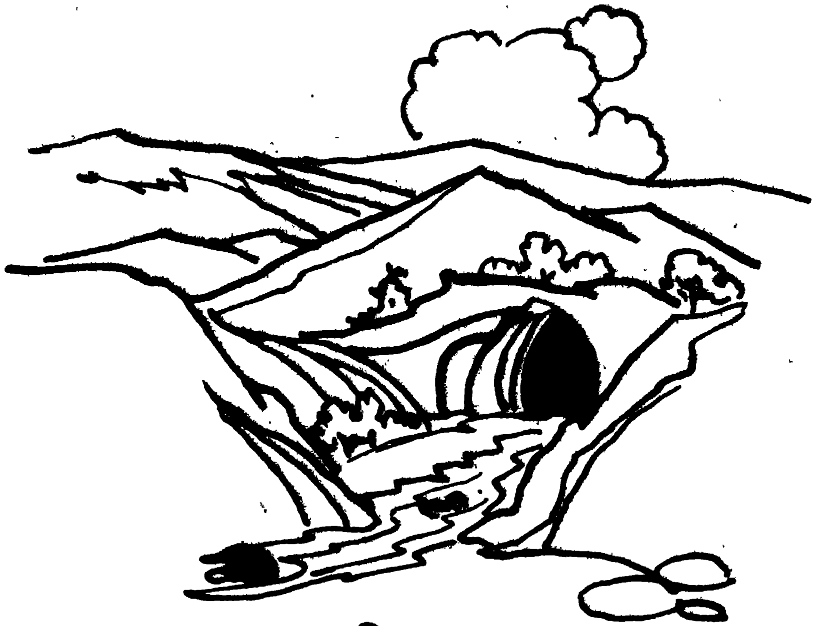
আমার হাতে জামা-কাপড় জিনিসপত্র গছিয়ে দিয়ে শিউলি আর গার্গী আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সাথে স্নান করে চলেছে। জলের বুকে মৃণালভুজের ললিত বিলাস নয়, এক হাতের এলোপাথাড়ি সঞ্চালন। অন্য হাত ঘাটে-আটকানো চেনের আশ্রয়ে—স্রোতের তোড়ে বেসামাল হয়ে ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা পেতে। এদিকে ঘাটের উপরে জিনিষপত্র সামাল দিতে গিয়ে হাত থেকে ক্যামেরা পড়ে গেল। ভাগ্য ভাল জলে পড়েনি বা ভেঙে যায়নি।

যতই তাড়া দিই ওদের ওঠার নাম নেই। স্নানে নামার সময় ছিল 'নিদারুণ ঠাণ্ডা জল', কিন্তু এখন সেকথা মনে নেই। জামাকাপড় ক্যামেরা ব্যাগ একপাশে গুছিয়ে রেখে আমিও নেমে পড়লাম। স্নান করতে করতেই একটু নজর রাখলে চুরি যাওয়ার ভয় নেই।

স্নানের পরে মহিলাদের পোষাক বদল করার সময় একটু অসুবিধা হয় বটে—বিশেষত হাওয়ার জন্য, কিন্তু তারই মাঝে কায়দা করে পোষাক বদল হচ্ছে। হাওয়ার অসভ্যতা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনেক মহিলাই শংকরাচার্যের বেদীর কাছে যাচ্ছেন। একটু আড়ালও পাওয়া যায়। তাছাড়া বেদীর উপরের ঘেরাটোপ থেকে শংকরাচার্য চারিদিকে দৃষ্টি রাখছেন—সঙ্গে চারজন প্রধান শিষ্য—ত্রোটকাচার্য, সুরেশ্বরাচার্য, হস্তমলকাচার্য এবং পদ্মপাদাচার্য।

দুপুরে বিশ্রাম নিয়ে পড়ন্ত বিকেলে আবার ঘাটে এলাম আরতি দেখতে। দেখেও যেন আশ মেটে না। আজ দেখলাম ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে। পুলিশ বারবার চেষ্টা করেছে ব্রিজের রেলিঙের কাছ থেকে এবং ঘাটে নামার সিঁড়ির উপর থেকে ভীড় সরানোর জন্য। কিন্তু হাজার হাজার দর্শক-যাত্রীদের সরানো কি সম্ভব? বারবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ। পুলিশের অবস্থা সত্যিই করুণ। চেষ্টা তো করে যেতেই হবে, কেন না দর্শকদের প্রবল চাপে রেলিঙ ভেঙে যে কোনো সময় বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সাধারণ জনতা কোনোকালেই সহজভাবে কথা শোনে না। প্রশাসন-পুলিশের তরফ থেকে আরো কড়াভাবে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

আগামীকাল সকালে গঙ্গোত্রীর উদ্দেশে রওনা হব। মন্তিবাজারে অনেক রাত অবধি কেনাকাটা হল।



ঋষিকেশ

চারধাম বলতে বোঝায় উত্তরে বদ্রীনাথধাম, দক্ষিণে রামেশ্বরধাম, পুবে পুরীধাম এবং পশ্চিমে দ্বারকাধাম। এককালে আমাদের দেশ বহু ক্ষুদ্র-খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যুগে-যুগে রাজা গিয়েছে এসেছে, নিজেদের মধ্যে হানাহানি মারামারি করেছে, রক্তস্রোত বয়েছে, রাজ্য পুড়ে ছারখার হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের মানসিকতাকে আঘাত করতে পারেনি। বিশাল ভারতের চারদিকের চারটি ধাম সারা দেশবাসীকে বিনি-সুতোর বাঁধনে এক করে রেখেছে।

এখানে—এই উত্তরাখণ্ডে চারধাম বলতে বোঝায় কেদারনাথ, বদরিনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী। হরিদ্বার ঋষিকেশ থেকে এককালে যাত্রীদল পায়ে-হেঁটে রওনা হতেন পুণ্যধামের উদ্দেশে। কেউ যেতেন দুই ধাম কেদার বদরি বা গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী, কোন দল একই যাত্রায় চারটি ধামেই যেতেন অবর্ণনীয় কষ্ট, বাধা ও অসুবিধা সহ্য করে।

হিমালয়ের ডাকে আমরা প্রথমে যাব গঙ্গোত্রী গোমুখ। সেখান থেকে কিছুটা ফিরতি পথে ধরাসু। ধরাসু থেকে বারকোট হয়ে যমুনোত্রী। যমুনোত্রীতে পুজো দিয়ে মুসৌরি-দেরাদুন হয়ে ফিরে আসব হলেও-হতে-পারা কল্লোলিনী- তিলোত্তমা কলকাতার-গঙ্গারই কোলে।

হরিদ্বার থেকে গঙ্গোত্রী ২৭৩ কিলোমিটার, গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ হয়ে আবার গঙ্গোত্রী ৩৮ কি.মি., গঙ্গোত্রী থেকে ধরাসু-বারকোট হয়ে যমুনোত্রী ২৩২ কি.মি.

এবং যমুনোত্রী থেকে মুসৌরি হয়ে দেরাদুন ১৭৬ কি.মি. —সব মিলিয়ে আমাদের মোট পাড়ি হবে ৭১৯ কিলোমিটার। এর মধ্যে গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও হনুমানচটি-যমুনোত্রী যাতায়াত পদব্রজে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার—যদি ঘোড়া বা ডাণ্ডি না নিই। পরে অবশ্য পরিস্থিতির প্রয়োজনে শেষের দিকের সূচির কিছু বদল হয়েছিল। সেকথা অবশ্য যথাসময়ে।

প্রাথমিক প্রস্তুতির সময় বেড়ানোর এই অংশটুকু নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। এখান থেকে কন্ডাকটেড ট্যুরে যাওয়া হবে, না হরিদ্বার-ঋষিকেশ পৌঁছনোর পরে গাড়োয়াল-মণ্ডল-বিকাশ- নিগমের (GMVN) ব্যবস্থাপনায় যাওয়া হবে। সাধারণ বাসে যাতায়াতের প্রস্তাব আগেই নাকচ হয়ে গিয়েছিল। কলকাতায় বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সীতে খোঁজ নিয়ে দেখলাম এখান থেকে কেদার-বদরিনাথের যাত্রী বেশি, তাই সেই দুইধামে ট্যুরের সংখ্যাই বেশি। এছাড়াও অনেকে একযাত্রায় চারধাম অর্থাৎ কেদার-বদরি-গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী দর্শন করতে চান বলে এরকম ট্যুরের ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু শুধুমাত্র গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর জন্য আলাদা কোনো প্যাকেজ ট্যুর নেই।

এরপরে ছুটলাম বি-বা-দী বাগে ১২-এ নেতাজী সুভাষ রোডের দোতলায়—উত্তরপ্রদেশ পর্যটন উন্নয়ন সংস্থার দফতরে। ঋষিকেশ থেকে GMVN-এর ব্যবস্থাপনায় গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী দর্শনের আয়োজন আছে এবং কলকাতা অফিসে টাকা জমা দিলেই ব্যবস্থা হয়ে যায়। নানা কারণে এই ব্যবস্থা আমাদের পছন্দ হলো না (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

অতএব আমরা একটা গাড়ি ভাড়া করলাম। ভাগ্য ভাল চালক একজন বঙ্গসন্তান—মধুসূদন সাহা। অল্পবয়সী চটপটে ইয়ংম্যান। শুধু চারধাম নয়, যাত্রী নিয়ে হিল্লী-দিল্লীতেও ছুটে বেড়ায়। যাত্রা-পথে গাইডের মতো আমাদের অনেক তথ্যও জানিয়েছে।

ঘুম ভাঙল বেশ সকালে, গঙ্গা-বন্দনা শুনে। ভোরবেলার আন্তরিক স্তবগান নয়, ক্যাসেটের যান্ত্রিক নিবেদন। যাই হোক না কেন, শুনতে মন্দ লাগে না। মা-গঙ্গাকে প্রণাম জানিয়ে এবং মধুসূদনের উপর ভরসা রেখে আমরা রওনা হলাম সকাল সওয়া-সাতটায়। আগেই বলেছি আমাদের সারথির নাম মধুসূদন।

হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশের দূরত্ব মাত্র ২৪ কিলোমিটার। অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম মহাদেবের স্নেহধন্য মুনি—ঋষিদের এককালের তপোভূমিতে।

হরিদ্বারের মতো সমতলে নয়, শিবালিক পর্বতমালার একেবারে কোলে। উত্তরাখণ্ডের সব তীর্থের যাত্রা শুরু মূলত এখান থেকেই। দেশের প্রায় সব যাত্রীই—যাঁদের মধ্যে পুণ্যার্থীর সংখ্যাই বেশি—হরিদ্বারে হরি-কি-পাউরি ঘাটে স্নান করলেও, এখানকার গঙ্গায় স্নান না করে তীর্থযাত্রা করেন না।

গার্গী বলল—'তাহলে তো আমাদেরও এখানকার গঙ্গায় স্নান করতে হয়।'

আমি বললাম—'আমরা তো তীর্থযাত্রী নই—সখের বেড়িয়ে। এখানে স্নান না করলে তেমন দোষ হবে না।'

শিউলির নিদান—স্নানের অর্থ হচ্ছে দেহমন শুদ্ধ করা। গঙ্গায় ছোঁয়া-লাগা হাওয়ায় তো তা-ই হচ্ছে। আলাদাভাবে স্নান না করলেও চলবে।

আরো একটু এগিয়ে লছমনঝুলা। গাড়ি সরাসরি সেতু অবধি যায় না। গাড়ি থেকে নেমে একটু উৎরাই-পথে ঝুলা। পথে লক্ষ্মণেশ্বর শিবের মন্দির। কাছাকাছি দোকানে জলখাবার সেরে নিলাম। এক-দেড়ঘণ্টার উপর হাঁটতে হবে। ওখানেই অর্থাৎ খাবার টেবিলে আমাদের উল্টোদিকে বসেছিলেন দুজন আধবয়সী দম্পতি। বয়স হয়ে গেলেও মনের তারুণ্য বোধহয় যায়নি। গায়ে চাপানো টকটকে লাল ও গাঢ় বেগুনী রঙের মোটা উলের সোয়েটার, যার কাঁধ নেমে এসেছে হাতের কনুই পর্যন্ত।

পর্যটন দফতরের কাগজপত্রে বলা হয়েছে হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশ ২৪ কিলোমিটার এবং লছমনঝুলা ৩০ কিলোমিটার দূরে। অর্থাৎ ঋষিকেশের বারদুয়ারে লছমনঝুলা। এখানকার যাবতীয় দ্রষ্টব্য নদীর ওপারে অর্থাৎ গঙ্গার বাঁ-তীরে। পরমার্থ-নিকেতন, গীতাভবন, অন্যান্য মন্দির ও আশ্রম এবং ওপারেই কয়েক কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের উপর নীলকণ্ঠেশ্বর শিব।

লছমনঝুলার উপরে এসে দাঁড়ালাম। নিচে গঙ্গা বয়ে চলেছে। শিউলি আর গার্গীর বয়স বোধহয় কমে গিয়েছে। প্রায় ছোটাছুটিই শুরু করে দিল। চুরুট-মুখো বেগুনী সোয়েটার বলে উঠলেন—'অত ছোটাছুটি করবেন না ম্যাডাম। দেখছেন না লক্ষ্মণের দোলনা দুলছে।'

গার্গী দাঁড়িয়ে পড়ল।—'দুলুক না। এইটুকু দোলন ইঞ্জিনীয়াররা নিশ্চয়ই তাঁদের হিসেবের মধ্যে ধরে রেখেছেন।'

লাল সোয়েটার বললেন—'ঠিকই বলেছেন। ইউ আর রাইট। কলকাতার বাইরে এসেও কি একটু বেহিসাবী হতে পারব না?'

চুরুট-মুখো একটু শ্রাগ করে বললেন—'ওক্-কে। ঠিক হায়। ইউ এনজয় ইয়োরসেল্ভস।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—'আচ্ছা, সত্যিই কি লছমনজী এই সেতু তৈরি করেছিলেন?

উত্তর দিল পিউলি—'তাই কি হয়? লক্ষ্মণ যদি তৈরি করেও থাকেন কোনোকালে, তাহলে সেই সেতু কি আজও টিঁকে থাকতে পারে?'

—'আমি তা' বলছি না। ইট মে বী অ্যা রিকনস্ট্রাকটেড ব্রিজ। কিন্তু সত্যিই কি লছমনজী এখানে কোনো ব্রিজ তৈরি করেছিলেন?'

কি আর বলব? তবুও একটু হালকা সুরে বললাম—'লক্ষ্মণকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে মেনে নিলে অবিশ্বাস করার কি আছে?'

—'বেশ তো, তাই না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু তিনি যদি এত বড় ব্রিজ এক্সপার্ট হন, তাহলে তাঁর অ্যানসেস্টোরিয়াল জায়গা অযোধ্যায় সরযূ নদীর উপর, কিংবা পরে যেখানে থিতু হয়েছিলেন সেই লখনউতে গোমতী নদীর উপরে এরকম কোনো কিংবদন্তীর ব্রিজ নেই কেন?

এর যথার্থ উত্তর বোধহয় নেই। লছমনজী ব্রিজ এক্সপার্ট ছিলেন কিনা জানি না, তবে যে বিশ্বাস আমাদের মনে গেঁথে আছে, সেই বিশ্বাস অনুযায়ী শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা আক্রমণে যাওয়ার পথ সুগম করতে সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণে চীফ্ প্রজেক্ট ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন বানররাজ সুগ্রীবের অনুচর নল। তখন হয়তো নলের কাছে লক্ষ্মণ শিক্ষানবিশী করেছিলেন।

—'মো বী। ইট মো বী লাইক দ্যাট। কিন্তু, হোয়াই অব অল প্লেসেস, এখানে সেতু তৈরি হলো?'

মহিলাদের দল ব্যাগ-গীয়ার দিয়ে আমাদের দিকে ফিরে আসছিলেন। শেষ-আলোচনার জের টেনে লাল সোয়েটার বললেন,—'সত্যিই তো! এই বিদেশ বিভূঁইয়ে লক্ষ্মণ কেন—'

আর এক কিংবদন্তীর কথা শোনাতে হলো। রাবণ-নিধনের পরে সীতাকে উদ্ধার করে লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরলেন। সঙ্গে ছিলেন সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান ও আরো অনেকে। বিজয়-উল্লাস, আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও হৈ-হুল্লোড়ে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর লক্ষ্মণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সব সময় কেমন যেন একটা অস্বস্তি—অ্যানইজিনেস, কোনো কিছুতেই মনোসংযোগ করা যাচ্ছে না, কোনো কিছুতেই মন বসছে না। সব সময় কেমন যেন একটা—।

প্রিয় অনুজের এহেন অবস্থায় বিচলিত রামচন্দ্র কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হলে তিনি জানালেন যে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে নিধন করার জন্য শুধু-ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপই নয়, —তাঁকে অন্যায়ভাবে অসহায় অবস্থায় নিধন করার জন্য লক্ষ্মণের এই অবস্থা। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় তপস্যা করে মহাদেবের করুণা লাভ করা।

মহাদেবের স্নেহচ্ছায়ায় ঋষিকেশ তখন এই ধরাধামের পুণ্য তপোভূমি। অতএব, মহাদেবের তপস্যা করে পাপ মুক্ত হতে লক্ষ্মণ ঋষিকেশে এলেন। দীর্ঘ তপস্যার পর তিনি মহাদেবের দর্শন লাভ করলেন এবং সুস্থজীবন ফিরে পেলেন। যেখানে তিনি মহাদেবের দর্শন পেয়েছিলেন, সেখানে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করলেন। তাঁরই নামে তা' পরিচিত হলো লক্ষ্মণেশ্বর শিব নামে। ঝুলায় আসার পথে ডানহাতে সেই মন্দির। এবং গঙ্গা পারাপারের জন্য হয়তো এখানে রশি দিয়ে ঝোলানো সেতু নির্মাণ করেছিলেন। লক্ষ্মণেশ্বর শিবের মতো সেই ঝোলানো সেতু পরিচিত হয়ে ওঠে তাঁরই নামে—লছমনঝুলা।

লছমনঝুলার উপরে দাঁড়িয়ে আছি। ওপাশ থেকে পাহাড় শ্রেণী উঠে গেছে। সারি সারি পাহাড়। পাহাড়ের বুকে ঘন সবুজ গাছের সমারোহ। ঋজু ও উদ্ধত। নীচে বড় বড় পাথর ও ছোট নুড়ির সাথে খেলা করতে করতে বয়ে চলেছে পুণ্যতোয়া গঙ্গা—প্রাণস্বরূপিণী গঙ্গা।

আমাদের পাশ দিয়ে দুজন মোটামুটি ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা যেতেই সেতুটা দুলে উঠলো। একটু সতর্ক হয়ে তাকাতেই দেখি, একটু দূরে কয়েকটি চনমনে ছোকরা ইচ্ছে করে সেতু দোলাচ্ছে। চোখাচোখি হতেই এক ঝলক হাসি। কেদার-বদরি যাওয়ায় পীচঢালা পাকা সড়ক আজকাল গঙ্গার এদিক অর্থাৎ ডান তীর বরাবর, কিন্তু পায়ে-হাঁটা যুগে সড়ক ছিল এই ঝোলানো সেতু পেরিয়ে নদীর বাঁ-তীর ধরে এবং সেই হাঁটা পথ সোজা গিয়ে উঠত গাড়োয়ালের শ্রীনগরে।

পরমার্থ নিকেতন, স্বর্গাশ্রম এবং গীতাভবন দেখলাম। পরমার্থ-নিকেতনে মূর্তিতে পৌরাণিক-কাহিনী। এরই গঙ্গার দিকের বারান্দা থেকে লছমনঝুলার সুন্দর ভিউ। ছবি তুললাম খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে। স্বর্গদ্বার আশ্রমে প্রথম যেটা চোখে পড়ে, তা হলো এর সুবিন্যস্ত রূপ ও সার্বিক পরিচ্ছন্নতা। গীতা ভবনের দেয়ালে গীতার বহু শ্লোক উৎকীর্ণ এবং ছবিতে শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী। এই চত্বরের ভেতরে এবং ভবনের দোতলায় অতিথি-তীর্থযাত্রীরা রাত্রিবাস করতে পারেন।

ঋষিকেশের ঘাটগুলো সুন্দরভাবে বাঁধানো। ঘাটে স্নানার্থীর সংখ্যা হরিদ্বারের তুলনায় নগণ্য। এখানেও সাঁঝবেলাতে গঙ্গারতি হয়, প্রদীপ ভাসানো হয়, তবে হরিদ্বারের মতো জমজমাট নয়।

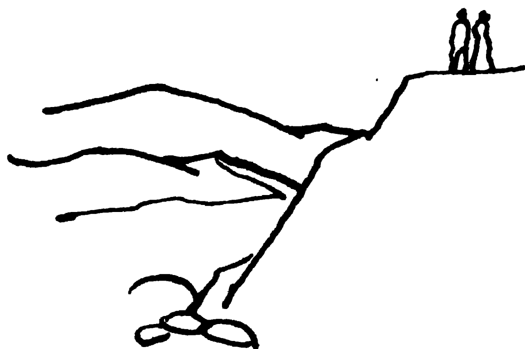
এখান থেকেই নীলকণ্ঠেশ্বর শিব-মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা। ১২ কিলোমিটার পাহাড়ি পথ। প্রায় হাজার চারেক ফুট উচ্চতায় সুন্দর পরিবেশে শিবমন্দির। এবারে সময় দেওয়ার সময় নেই। হিমালয় আবার ডাক দেবে। তখন হরিদ্বারে না থেকে থাকব এখানে—পাহাড়ে আর নদীর কোলে।

ঝুলাপুল তৈরি করেছে—রামঝুলা। আমরা রামঝুলা হয়ে ফিরলাম। শিউলি বলল—'লছমনঝুলা নিয়ে তুমি লক্ষ্মণের একটা গল্প শোনালে। অ-নে-ক বছর পরে রামঝুলা নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের নামে নতুন গল্প তৈরি হবে না তো?'

—'হতেই পারে। কোনো জায়গা সম্বন্ধে ঘটনা বা কিংবদন্তী না থাকলে আপনা-আপনিই গপ্পো তৈরি হয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে কি, গল্প না থাকলে বেড়ানোর জায়গায় তেমন ইমেজ তৈরি হয় না।'

বাইরে বেশ সস্তাতেই হিং, লবঙ্গ বিক্রি হচ্ছে। হিং, লবঙ্গ কি এ অঞ্চলে হয়? গার্গী এগিয়ে গেল।

অনেক হাঁটাহাটি হয়েছে। যেখানে গাড়ি দাঁড় করানো ছিল, তার কাছেই গঙ্গার উপরে দোকানের গরম চা আমাদের ডাক দিচ্ছে। এই ডাকে সাড়া না দেওয়াটা অনুচিত।





নরেন্দ্র-চাম্বা-টেহরী

ঋষিকেশ ছাড়ার মুখে গাড়ির কাগজপত্র পরীক্ষা হলো। এখান থেকে নরেন্দ্রনগর মাত্র ষোল কিলোমিটার। ঋষিকেশ ছাড়ার কিছু পরেই আমরা টেহরী-গাড়োয়ালে প্রবেশ করেছি। এই জেলারই সদর-দফতর নরেন্দ্রনগর। নরেন্দ্রশাহ এই জায়গাটিকে তৈরি করেছিলেন—সাজিয়ে তুলেছিলেন সবরকম সুযোগ-সুবিধার দিকে নজর রেখে।

নরেন্দ্রনগরের পরে বড় জায়গা চাম্বা। এখান থেকে মুসৌরির রাস্তা বার হয়ে গেছে—দূরত্ব ৫৫ কিলোমিটার। চাম্বা থেকে টেহরী ২১ এবং হরিদ্বার থেকে ১০৬ কিলোমিটার। শহরটি সম্বন্ধে অনেক কথাই পড়েছিলাম। তাই হরিদ্বার থেকে রওনা হওয়ার সময় স্থির করে রেখেছিলাম যে এখানে দুপুরের খাওয়া সারবো এবং নিজেদের হেফাজতে যখন গাড়ি রয়েছে, সময়ও আছে, ভাগীরথী ও ভীলগঙ্গার সঙ্গমে শহরটি একটু ঘুরে দেখে নেব। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। ভাগীরথীর উপর বাঁধ নির্মাণের কাজ চলছে—বিরাট অঞ্চল জুড়ে জলাধার হবে। তাই সরকার সেখানকার নাগরিক-জীবনকে অন্যত্র পুনর্বাসন করেছে। বহু স্থানীয় জনসাধারণ এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে। পাহাড়ি-পথের অনেক জায়গায়—এমনকি গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যাওয়ার পথেও প্রতিবাদ জানানো প্রচারপত্র ও পাথর-লিখন চোখে পড়েছে। তাঁদের বক্তব্য এই প্রকল্পের পূর্ণ রূপায়নের জন্য অনেক পাহাড় কাটতে হচ্ছে, অরণ্য নির্মূল করতে হচ্ছে এবং তার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে, যার

ফলস্বরূপ নেমে আসতে পারে ভয়াবহ বিপর্যয়। আশঙ্কা অমূলক না হলেও একথা ঠিক যে, কোনো প্রকল্প পরিকল্পনার আগে এবং করার সময় পরিবেশের কথা বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হয়। তাছাড়া, পরিবেশ-দফতরের সবুজ-সংকেত না পেলে পরিকল্পনার অনুমোদনও হয় না।

টেহ্‌রীকে পাশ কাটিয়ে এখনকার মতো একটা বিকল্প-পথ তৈরি হয়েছে এবং সেই পথ ধরে টেহ্‌রীকে একপাশে রেখে আমরা ধরাসুর দিকে এগিয়ে চললাম।

টেহ্‌রী উত্তরাখণ্ডের এক বিশিষ্ট শহর এবং অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরের দিকে রাস্তা গিয়েছে উত্তরকাশী হয়ে গঙ্গোত্রী গোমুখ, বাঁ-হাতে একটু নেমে চাম্বা হয়ে মুসৌরি, নিচের দিকে ঋষিকেশ হরিদ্বার এবং ডানদিকে একটু এগিয়ে দুভাগ হয়ে একটি পথ চলে গিয়েছে তিলওয়াড়া ছুঁয়ে গুপ্তকাশী-গৌরীকুণ্ড হয়ে কেদারনাথ এবং অপরটি শ্রীনগর-পাউরি ও দেবপ্রয়াগের দিকে।

৭৭০ মিটার অর্থাৎ ২৫২৬ ফুট উচ্চতায় শহরটি টেহ্‌রী-গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী। "টেহ্‌রী-গাড়োয়াল" কথাটির সাথে সাথেই "ব্রিটিশ-গাড়োয়াল" কথাটি এসে পড়ে। অতএব, ইতিহাসের পাতায় একটু চোখ বোলানো যেতে পারে।

অনেককাল আগে তখনকার ভারতের অন্যান্য স্থানের মতোই এই উত্তরাখণ্ডের অংশে ছিল আঞ্চলিক প্রভুত্ব। তাঁরা গড় নির্মাণ করেছিলেন নিজেদের এলাকা সুরক্ষিত করতে। 'গড়' থেকেই সামগ্রিক অঞ্চলটির নাম দাঁড়িয়ে যায় 'গাড়োয়াল'। এদের একটা অংশ ছিল অসমের পার্বত্য অঞ্চল থেকে আগত খাসিয়ারা। কালক্রমে তারা স্থানীয় পাহাড়িদের সাথে মিলে-মিশে যায়। সময় আরো গড়িয়ে যায়। সমতল-আর্যাবর্ত থেকে অনেকেই উত্তরাখণ্ডে এলেন ভাগ্যান্বেষণে। এরা শক-হূণ দল -পাঠান-মোগল নয়—ভগবানের সাক্ষাৎ আশীর্বাদধন্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ও প্রভুত্ব-অভিলাষী ক্ষত্রিয়-নন্দন। বীরত্বের সাথে কৌশলের সংমিশ্রণে এঁরা বিভিন্ন গড় দখল করে নিলেন। এঁদেরই পরবর্তী প্রজন্মের একজন অজয়পাল নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন শ্রীনগরে। কাশ্মীরের শ্রীনগরে নয়—গাড়োয়ালের শ্রীনগর। এলাকায় তখন নিরুপদ্রব শান্তির সহজ সুন্দর জীবনধারা।

কিন্তু ছন্দপতন হলো উনিশ-শতকের একেবারে গোড়ায়। প্রদ্যুম্ন শাহ তখন গাড়োয়ালের রাজা। প্রতিবেশী রাজাদের সাথে সখ্যতা আছে। যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে নেপাল ও তিব্বতের সাথে। কিন্তু সেনাপতি বিবাহ করলেন এক গোর্খা মহিলাকে। মহিলারা যেমন সুখ শান্তির বাতাবরণ তৈরি করেন, সেরকম তাঁদের মধ্যে লেডি ম্যাকবেথের ছায়াও আছে। সেনাপতির গোর্খা স্ত্রী দেখলেন রাজা প্রদ্যুম্ন শাহ সেনাপতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন 'আমাকে-বিরক্ত-কোরোনা' বলয়ের মধ্যে। দুই আর দুইয়ে নাকি চার হয়।

সেনাপতি-স্বামীকে তাতিয়ে দিলেন তিনি। শাসন-ক্ষমতা ও রাজাসনের হাতছানি উপেক্ষা করা সহজ নয়। স্ত্রীর প্ররোচনায় শ্বশুরবাড়ির দেশ থেকে নেপালরাজের সাহায্য চাইলেন। ১৮০৩ সালে গাড়োয়াল রাজ্য আক্রান্ত হলো। তখনও মীরজাফরেরা জন্ম নিত। সেনাবাহিনীর যে বিরাট অংশ সেনাপতির অধীনে, তারা দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করল। রাজার বিশ্বস্ত রক্ষীদল অসহায়ের মতো মৃত্যুবরণ করল। বীরের মতোই প্রাণ দিলেন প্রদ্যুম্ন শাহ্। গাড়োয়ালের বিরাট অংশ নেপাল রাজের পদানত হলো। পুত্র সুদর্শন শাহ্ পালিয়ে বাঁচলেন।

হৃতরাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য প্রায় বারো বছর পরে সুদর্শন শাহ্ ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সুদর্শন শাহ্ নিশ্চয় প্রায় বছর চল্লিশ আগের কুচবিহার রাজ্যের ছত্রনজীর খগেন্দ্রনারায়ণের নাম জানতেন না। জানতেন না ১৭৭২-৭৩ সালের ঘটনা। জানতেন না, ভুটানরাজের হাত থেকে বন্দী কুচবিহাররাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ও কুচবিহার রাজ্যকে মুক্ত করে ইংরেজ কি মূল্য আদায় করে নিয়েছিল। জানা থাকলে সুদর্শন শাহ্ সেই ভুল আর নিশ্চয়ই করতেন না, কেন না তাহলে তাঁর নিশ্চয়ই খেয়াল হতো হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ। ইংরেজ গাড়োয়াল থেকে নেপালীদের হটিয়ে দিল এবং সেই সাহায্যের বিনিময়ে সুদর্শন শাহকে দেরাদুন (তখনও মুসৌরি তৈরি হয়নি), রাজধানী শ্রীনগর, কেদারনাথ-বদরিনাথ সমেত রাজ্যের ভাল অংশকে খেসারৎ স্বরূপ তুলে দিতে হলো ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। এই অংশের নাম হলো 'ব্রিটিশ গাড়োয়াল' এবং পশ্চিমদিকে যে অংশটুকু রইলো সেটুকু নিয়েই খুশি থাকতে হলো সুদর্শন শাহকে। ভাগীরথী ও ভীলগঙ্গার সঙ্গমে ছড়ানো পাহাড়ি-উপত্যকায় গড়ে উঠলো নতুন রাজধানী টেহরী এবং 'ব্রিটিশ গাড়োয়াল' থেকে পার্থক্য বোঝানোর জন্য এই খণ্ড-ক্ষুদ্ররাজ্য পরিচিত হলো 'টেহরী-গাড়োয়াল' নামে। এবং শুধু খণ্ড-ক্ষুদ্র রাজ্য নয়—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্য। এর পরের—অনেক পরের ইতিহাস স্বাধীনতার পর ভারতভুক্তি।

টেহরীকে পাশে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি। ডানহাতে এই প্রথম গঙ্গা চোখে পড়ল। ঋষিকেশে যে গঙ্গাকে ছেড়েছিলাম সে গঙ্গা নয়—এই অংশের নাম ভাগীরথী। একই নদীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম হলেও তার মাহাত্ম্য কোথাও কোনো অংশে কম নয়। গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক, সে সৌরভ বিতরণ করে।

টেহরীতে দুপুরের খাওয়া সারবো এরকমই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হয়ে উঠল না। অতএব ধরাসু ছাড়া উপায় দেখছি না। টেহরী ও ধরাসুর মধ্যে ভাণ্ডিয়ানা কয়েকটা বাড়ি নিয়ে ছোট গ্রাম। এখানে তো তবুও বেশ কয়েকটা বসতবাড়ি চোখে পড়ল, কিন্তু নদীর ওপারে নগন্য চার-পাঁচটা আস্তানার গ্রামও চোখে পড়েছে। প্রাত্যহিক

জীবনযাত্রারা জন্য ওদের এপারের পাকা সড়ক মারফৎ যোগাযোগ রাখতে হয়। এপারে আসা তো সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পাহাড়ি নির্জনতা কিভাবে মানিয়ে নেয় এরা ?

ওপারের পাহাড় খুব উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়ায় নি। সবুজের সমারোহ কমে পাহাড়ের বুকে রুক্ষতার ছাপ। দূর থেকেও বেশ কয়েকটা ধ্বংসের চেহারা চোখে পড়ল। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। হিমালয়ের এই অঞ্চলেও যে সমতলের দুপুরের মতো ঝলসানো-রোদ তাতিয়ে দেবে কে জানতো !

হরিদ্বার থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার পথ পেরিয়ে ধরাসু-এসে পৌঁছলাম পৌনে-দুটোরও কিছু পরে।

এখান থেকে বাঁদিকে যমুনোত্রীর রাস্তা বার হয়ে গেছে বারকোট হয়ে। ধরাসু থেকে বারকোট ৫৮ এবং বারকোট থেকে হনুমান চটি ৩৬ কিলোমিটার। হনুমানচটি পর্যন্ত গাড়ি চলার পাকাসড়ক এবং সেখান থেকে যমুনোত্রী ১৩ কিলোমিটার পায়ে-হাঁটা-পথ। আমরা বাঁদিকে বাঁক না নিয়ে সোজা গঙ্গোত্রী যাব উত্তরকাশী হয়ে। কিন্তু এখন গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী মাথায় থাকুন, আগে খাওয়া দরকার।

কিন্তু যা ধারণা করেছিলাম তা নয়, ধরাসু অতি সাধারণ জায়গা। সেরকম গোছানো খাবার জায়গা নেই। পাহাড়ি-পথে অবশ্য সেরকম ধারণা পোষণ করা সঙ্গতও নয়। আমরা যেখানে বসলাম, সেখানকার জানালা দিয়ে ভাগীরথী দেখা যাচ্ছে। একটু দূরে। নদীর তীর পর্যন্ত ধাপে ধাপে শষ্যক্ষেত নেমে গেছে। নদীর বুকে ছোটবড় উপলখণ্ড। তারই পাশ দিয়ে চঞ্চলা কিশোরীর মতো ভাগীরথী নেমে চলেছে দেবপ্রয়োগে অলকানন্দার সাথে মিলিত হবার জন্য। উপল-মুখর ভাগীরথীর বুকে রুপোলি রোদের খেলা। ভারি ভাল লাগছে।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে ধরাসু ছাড়লাম। এখানে ধরাসু নদী এসে মিশেছে ভাগীরথীর সাথে। ধরাসু নদী পার হয়ে আরো ঘণ্টাখানেক পরে পৌঁছে গেলাম উত্তরকাশী—৩৮০০ ফুট উচ্চতায় উত্তরাখণ্ডের সব চাইতে বড় শহর। হরিদ্বার থেকে দূরত্ব ১৭৬ কিলোমিটার।

আজ আমাদের এখানেই যাত্রা বিরতি।





উত্তরকাশী

চারিদিকে পাহাড়ের মাঝখানে সুন্দর এক উপত্যকায় আধুনিক পার্বত্য-শহর উত্তরকাশী। আমরা উঠেছিলাম ভাগীরথী-তীরে ট্যুরিস্ট-রেস্ট-হাউসে। গঙ্গোত্রী যাওয়ার এবং সেখান থেকে ফেরার পথে মোট প্রায় দুদিন ছিলাম উত্তরকাশীতে। জনান্তিকে একটা কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। যুক্তি সঙ্গত কারণ ছাড়াই 'উত্তরকাশী' নামটার প্রতি আমার অহেতুক একটা মোহ ছিল। তাই সুযোগ পেয়ে পায়ে হেঁটে এই ছোট শহরে ঘুরে বেড়িয়েছি।

কাশী হিন্দুদের পরম পবিত্র তীর্থ এবং বিশ্বাস অনুযায়ী বাবা বিশ্বনাথের খাস জায়গা। কিন্তু হিমালয়ের এ অঞ্চলের ভক্তপ্রাণ নরনারীর পক্ষে সেকালে কাশী গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের দর্শন সহজ ছিল না। এখানে গড়ে উঠল কাশীর বিকল্প। কাশীর মতো এখানেও গঙ্গা উত্তরবাহিনী, এখানেও আছে বাবা বিশ্বনাথের মন্দির, মণিকর্ণিকা ঘাট ও অন্যান্য ঘাট। উত্তরাখণ্ডের এই পুণ্য স্থানটির নাম হলো উত্তরকাশী। আরো একটা মিল রয়েছে। প্রায় ১৩ কিলোমিটার দক্ষিণে নাকোরির কাছে ভাগীরথীর সাথে বরুণার সঙ্গম এবং ৪ কিলোমিটার উত্তরে গাঙ্গোরির কাছে ভাগীরথী ও অসি নদীর সঙ্গম। বরুণা ও অসি নদীর মধ্যবর্তী অংশই উত্তর বারাণসী—অর্থাৎ উত্তরকাশী। উত্তরপ্রদেশের পর্যটন দফতরের প্রচারপত্র ও পুস্তিকাতে উত্তরকাশীর পাশে লেখা রয়েছে—Surrounded by rivers Varuna and Assi.। অন্যরকম

কথাও শুনেছি। কালে কালে পৃথিবী অনাচারে পূর্ণ হলে এই স্থানই হবে আধ্যাত্মিক পীঠস্থান এবং স্বয়ং বিশ্বনাথ উত্তরকালে কাশীর বদলে এখানে বিরাজিত হবেন। তাই এই স্থানের নাম উত্তরকাশী।

নামকরণের ভূগোল, ইতিহাস বা পুরাণ যাই হোক না কেন, স্বীকার করতেই হবে, হিমালয়ের বুকে—গঙ্গার কোলে মনোরম এক উপত্যকায় গড়ে উঠেছে সুন্দর এই জেলা-শহরটি। বিলাসবহুল হোটেল, হাসপাতাল, সিনেমাহল, বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতরের অফিস-বাড়ি, পরিবহণ-কেন্দ্র, বাজার দোকানপাট নিয়ে জমজমাট। পর্বতারোহীদের শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে দার্জিলিঙে আছে হিমালয়ান মাউণ্টেনীয়রীং ইনস্টিটিউট এবং এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউণ্টেনীয়রীং। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেকে এখানে আসে পর্বতারোহণের শিক্ষা নেওয়ার জন্য।

ইদানীং বিশশতকের শেষ দশকে উত্তরকাশীর রাজনৈতিক হাওয়া হঠাৎ অন্যরকম হয়ে বইতে শুরু করেছে। 'হঠাৎ' কথাটা ব্যবহার করা হয়তো ঠিক হয়নি, কেন না প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর প্রাক-পর্ব থেকেই যায়। হিমালয়ের বুকে চামোলি, পিথোরাগড়, নৈনিতাল, আলমোড়া, পাউরি, উত্তরকাশী, দেরাদুন ও হরিদ্বার—এই পার্বত্য জেলাগুলির সমষ্টিগত অঞ্চল 'উত্তরাখণ্ড' হিসাবে পরিচিত। দাবী উঠেছে উত্তরাখণ্ডে আলাদা রাজ্যের মর্যাদা দিতে হবে।

গঙ্গোত্রী থেকে ফিরতি-পথে যে হোটেলটিতে উঠেছিলাম, সেখানকার কাউণ্টারে নাম-ধাম ইত্যাদি বিবরণ লেখার সময়, আজকাল হোটেল-চার্জ বেড়ে যাওয়া প্রসঙ্গে কথায় কথায় হালকাভাবেই বলেছিলাম—'তোমরা এভাবে ভাড়া বাড়ালে আমরা চলি কি করে?'

—'কেন?'

বলেছিলাম—তোমরা তো নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে সারা ভারতে বাঙালি পর্যটকের সংখ্যাই বেশি। এর মধ্যে একটা বড় অংশ টাকা দিয়ে যাচ্ছে হরিদ্বার, কেদার-বদরি, গঙ্গোত্রী-গোমুখ-যমুনোত্রী, মুসৌরি, দেরাদুন, নৈনিতাল, রাণীক্ষেত, আলমোড়া, কৌশানি, লখনউ, বেনারস, আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন এবং এলাহাবাদের প্রয়োগে—অর্থাৎ তোমাদের এই উত্তরপ্রদেশে। তোমাদের তো উচিত বাঙালিদের জন্য একটা কনসেসনাল রেট করা। নয় কি?

কথাটা হালকাভাবেই বলেছিলাম। উত্তরে কাউণ্টারের ছেলেটিও হাসতে হাসতে সেভাবে কথার পিঠে কথা বলেছিল। কিন্তু কাউণ্টারের পাশে দাঁড়ানো ২৩/২৪ বছর বয়সের এক নওজোয়ান যা বলল, সেই কথাটির জন্যই এই প্রসঙ্গের

অবতারণা। ছেলেটি বলল—এবং হালকা সুরে নয়—এখন আপনারা টাকা ঢালছেন উত্তরপ্রদেশে, হয়তো পরের বার টাকা দেবেন উত্তরাখণ্ডকে।

রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে যেতে চাই না। উত্তরপ্রদেশ বা উত্তরাখণ্ড কিংবা যে কোনো নাম এই অঞ্চলের হোক না কেন, শেক্সপীয়রের কথাটা তো মিথ্যে হওয়ার নয়। গোলাপকে যে নামে ডাকো, সুরভির কমতি হবে না। হিমালয়ের দেবালয়ে আমাদের যাত্রা ব্যাহত হবে না।

উত্তরকাশী ছিল, টেহরী-গাড়োয়ালের একটা প্রধান অংশ। স্বাধীনতার পরে টেহরী-গাড়োয়াল ভারতের অঙ্গ হিসাবে সংযুক্ত হলে এটি কুমায়ুন ডিভিশনের একটি জেলা হিসাবে গণ্য হয়। উত্তরকাশীর গুরুত্ব এই জন্য যে, ভারতের দুই প্রধান নদী গঙ্গা-যমুনার উৎসের কাছে গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুনোত্রীর মতো প্রসিদ্ধ পুণ্যতীর্থ এই জেলাতেই অবস্থিত।

টুরিস্ট রেস্ট হাউসটি ছিমছাম। লাগোয়া ক্যান্টিনও রয়েছে। যাত্রা শুরু করেছি সকালে এবং এ সময়ের অ-সাময়িক গরমে গা প্যাচ প্যাচ করছিল। উষ্ণ জলে স্নান সেরে নিলাম। দারুণ তাজা লাগছে। ততক্ষণে গরম চা এসে গিয়েছে। ভাল-লাগার সোনায় সোহাগা।

কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর বার হলাম। প্রধান সড়কে যে কোনো বড় শহরের মতোই দোকানপাট-হোটেল, লোকজনের সমাবেশ। সমতল শহরের মতো ততটা গ্যাঞ্জাম না হলেও, ব্যস্ততা বা হৈ চৈ কম নয়। সব চাইতে খারাপ লাগল রাস্তার উপর বাস/গাড়ির এলোমেলো পার্কিং দেখে। এবং তার সাথে রাস্তার পাশে রেস্তোঁরা বা পান-সিগারেটের দোকান থেকে হিন্দি ফিলমিগানের সরোষ গর্জন।

বাংলো থেকে বার হওয়ার মুখে লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে দুজন মহিলার সাথে কথা হচ্ছিল। বঙ্গসন্তান। তাঁদের একজন বলছিলেন—'বিশ্বনাথ মন্দিরের যেরকম নাম শুনেছিলাম, সে হিসাবে আহামরি একেবারেই নয়—।'

শিউলি বলল—'কেন, আপনি কি মন্দিরের বাইরের চেহারার কথা বলছেন ?'

—'ঠিক তাই। একেবারে সাদামাটা। একেবারেই চোখ টানে না।'

—'কিন্তু মন্দিরের বহিরাবরণটাই তো বড় কথা নয়। বড়কথা মন্দিরস্থ দেব-দেবী। যদি শুধুমাত্র বাইরের—'

অপর মহিলা বললেন—'যাই বলুন ভাই, মন্দির-স্থাপত্যের এবং বহিরাঙ্গের সৌন্দর্যেরও তো একটা বিশেষ স্থান আছে।'

বিশ্বনাথ মন্দিরে এলাম। উত্তরকাশীতে মন্দির আছে অনেক, তবে বিশ্বনাথ মন্দিরটিই প্রধান। অনেক গাছ-গাছালি, বড় একটা ইঁদারা ও বিরাট চত্বর নিয়ে

মন্দিরের পরিধি। বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে এলাম শক্তি-মন্দিরে। এটি আলাদা হলেও বিশ্বনাথ-মন্দির চত্বরেই এবং এরই একটা অঙ্গ বলা যায়। এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে প্রায় ফুট পনেরো উঁচু অষ্ট ধাতুর তৈরি ত্রিশূল। মন্দিরের মাথা ছাড়িয়ে আকাশ-পানে প্রসারিত। বিরাট আকারই শুধু নয়, —দারুণ বলিষ্ঠ চেহারা।

আমাদের পাশেই আর এক দল ছিল। ভদ্রলোকের জাঁদরেল চেহারা। দলের একটি প্রগলভ কিশোরী বলে উঠল —'জিজাজী! দেখা হ্যায় কিতনা বুলন্দ ত্রিশূল! আপসে উঠায়া জায়েগা?'

—'কিঁউ ন্যাহী প্যারী শালী। লেকিন ইয়ে দেওস্থানসে ত্রিশূল উঠানা—ম্যঁয় পাপ কা ভাগীদার ন্যাহী বননা' চাহতা হুঁ।'

ভদ্রলোকের শালিকা খিল-খিল হাসিতে ভেঙে পড়ল। পাপের দোহাই দেবেন না জামাইবাবু। আপনার মতো অন্তত দশটা লোক লাগবে এই ত্রিশূল তুলতে।

কথাটা অবশ্যই আক্ষরিকভাবে সত্যি। গার্গী বলল 'সত্যি বউদি—কি বিরাট ওজনদার ত্রিশূল, না গো?' পাশ থেকে মধুসূদন যোগ করল—'মানুষের পক্ষে এটা তোলা তো সম্ভব নয় দিদি। এটি খোদ মহাদেবের ত্রিশূল।'

—'বল কি মধুসূদন! একেবারে খোদ মহাদেবের?' শিউলির বিস্ময়।

—'আপনারা বিশ্বাস করবেন না জানি। এই ত্রিশূল দিয়েই তো মহাদেব—'

মধুসূদন তার বৌদি ও দিদিমণিকে সংক্ষেপে কিরাত-অর্জুনের যুদ্ধের কথা শুনিয়ে বলল যে এই ত্রিশূল দিয়েই যুদ্ধ করেছিলেন কিরতাবেশী মহাদেব। মধুসূদন সঠিক কাহিনীটিই বলেছে, তবে সেই যুদ্ধে ত্রিশূল ব্যবহৃত হয়নি, —অন্তত মহাভারতের বনপর্বে যে কাহিনী আছে, তাতে যুদ্ধে ত্রিশূল ব্যবহারের উল্লেখ নেই।

কপট পাশাখেলায় পরাজিত হয়ে পঞ্চপাণ্ডব বনবাসে গমন করে। বনবাস শেষে হৃতরাজ্য ফিরে পেতে হলে অস্ত্রবলে বলীয়ান হতে হবে। তাই, ইন্দ্রের কাছ থেকে দিব্যাস্ত্র লাভের জন্য অর্জুনকে পাঠানো হলো। অস্ত্রসংগ্রহে যাওয়ার পথে এক বন্যবরাহ অর্জুনের দিকে ধাবিত হলে, অর্জুন শরাঘাত করতে উদ্যত হতেই সেই বনেরই এক কিরাত জানায় বরাহটি তার শিকারের লক্ষ্য। অতএব অর্জুন যেন বিরত হয়। অর্জুন শুধু বারণ শুনলেন না তা নয়, কিঞ্চিৎ অহমিকার সাথে জানিয়ে দিলেন তিনি তৃতীয়পাণ্ডব অর্জুন এবং কিরাত যেন তাঁর শিকারের প্রতি শরনিক্ষেপ না করে। অর্জুনের মতো কিরাতও বারণ শুনল না। দুজনের ধনু থেকেই একযোগে শর নির্গত হলো এবং বরাহ প্রাণত্যাগ করল। দুজনেরই দাবি, তার শরাঘাতে বরাহ নিহত হয়েছে, অতএব শিকার তার প্রাপ্য। এই থেকেই

বাদানুবাদ, সংঘর্ষ। বনবাসী কিরাতের ঔদ্ধত্যে ক্ষিপ্ত অর্জুন তাকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন তাঁর শরবর্ষণ কিরাতকে স্পর্শ করতে পারছে না। তূণীরের সমস্ত বাণ শেষ হলে অর্জুন ধনু দিয়ে আঘাত হানলেন। তারপর একে একে খড়্গ যুদ্ধ, উৎপাটিত বৃক্ষ নিয়ে আক্রমণ এবং শেষে মুষ্টি ও মল্লযুদ্ধ চালিয়েও সামান্য এক কিরাতকে অর্জুন পরাভূত করতে পারলেন না। উপরন্তু, কিরাতের কঠিন বাহুপাশে অর্জুন হত-চৈতন্য। চেতনা ফিরে পেয়ে শক্তি ফিরে পেতে মাটির শিবলিঙ্গ গড়ে পুজো করে মালা দিতেই সবিস্ময়ে অর্জুন লক্ষ্য করলেন সেই মালা মূর্তি থেকে অদৃশ্য হয়ে সহাস্য-কিরাতের গলায় শোভিত হলো।

কিছুক্ষণ আগে অর্জুনের চেতনা লোপ পেয়েছিল বাহুযুদ্ধে, কিন্তু এখন বিস্ময় ও রোমাঞ্চ তাঁর চেতনার তন্ত্রীতে স্পন্দন তুলল। তিনি বুঝতে পারলেন, যাঁর দর্শনের জন্য তাঁর এতদিনের আকাঙ্ক্ষা, সেই পরম লগন এসে গিয়েছে। বুঝতে পারলেন, যে বনবাসী কিরাতকে তাচ্ছিল্য করেছিলেন, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব। হরষিত অর্জুন নতজানু হয়ে কিরাতের চরণ-বন্দনা করতেই দেখলেন তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন পিনাকপাণি মহাদেব।

মধুসূদন বলল—'আপনারা যাই বলুন স্যার, এখানকার গাইডদের বলতে শুনেছি, মহাভারতের সময়ে কিরাতবেশী মহাদেব ও অর্জুনের যুদ্ধ হয়েছিল এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে মানারিতে। সেই যুদ্ধে মহাদেব স্বয়ং এই ত্রিশূলটি ব্যবহার করেছিলেন। সেই ত্রিশূলটিই এখানে অধিষ্ঠিত।'

—'গাঁজা। স্রেফ গাঁজা।' মন্তব্যটা এল পেছন থেকে। ঘুরে তাকিয়ে দেখি ঋষিকেশে দেখা হওয়া সেই চুরুটমুখো ভদ্রলোক সঙ্গিনীসহ। এবার শ্রীমতীর অঙ্গে সবুজ কোট।

—'কেন—গাঁজা কেন'? সঙ্গিনীর প্রশ্ন।

—'গাঁজা বলছি এজন্য যে, যদি এটি সেই ত্রিশূলই হবে, তাহলে মরচে পড়বে না?'

শিউলি একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর একটু থেমে বলল—'ও! এই ব্যাপার! মরচে ধরেনি বলে আপনি গাঁজার আমদানি করলেন! কিন্তু মশাই, কুতুব-মিনার প্রাঙ্গণেও তো একটা লৌহ স্তম্ভ আছে, —দেড়হাজার বছরেও তো ওটায় কোন মরচে পড়েনি।'

—'ওটা আর এটা এক হলো?'

—'না হওয়ার কি-আছে? ওটা দেড় হাজার বছরের পুরনো আর এটা তিন-সাড়ে তিন হাজার বছরের কথা।'

—'আপনি তাহলে বিশ্বাস করেন, এটি সত্যিসত্যিই মহাদেবের ত্রিশূল?'

শিউলি হেসে বললো—'আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না। দশজনে এই কাহিনী বিশ্বাস করেন, সেটাই বড় কথা।'

মন্দির-প্রাঙ্গণে ধূমপান বোধহয় নিষেধ। ভদ্রলোক নিভন্ত চুরুট নাড়িয়ে ঘ্রাণ করলেন—'হুঁ! এরকম গপ্পো না থাকলে যে দেবস্থানের মাহাত্ম্য বাড়ে না। চলো যাওয়া যাক।' এবারে সঙ্গিনীর উদ্দেশে।

ওরা চলে যেতেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে গার্গী হেসে উঠল—'দারুণ দিয়েছো বৌদি! ভদ্রলোক একেবারে স্পিকটি-নট।'

মধুসূদন বোধহয় একটু জোর পেয়েছে। বেশ উৎসাহের সঙ্গে যোগ করল—'জানেন বৌদি, এই যে ত্রিশূলটি এখানে অধিষ্ঠিত, অনাদি লিঙ্গের মতোই নাকি এটির কোনো আদি নেই।'

—'তাই নাকি'? গার্গীর জিজ্ঞাসা।

—'হ্যাঁ দিদি। নেপালরাজ যখন গাড়োয়াল অধিকার করেছিলেন, তখন বিজয়-স্মারক হিসাবে ত্রিশূলটি তুলে নিজের দেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। স্থানীয় জনসাধারণের সকাতর অনুনয় পদদলিত করে দিনের পর দিন তাঁর বহু সৈনিক প্রবল শক্তি প্রয়োগ করেও এটি তুলতে পারেনি। হাল ছেড়ে তারা ফিরে যায়। জনতার সম্মিলিত আনন্দধ্বনি ওঠে—'জয় বাবা বিশ্বনাথের জয়।' গঙ্গার কলধ্বনি সে আওয়াজ বয়ে নিয়ে যায় গাঙ্গেয় আর্যাবর্তে এবং হিমালয়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে সে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে দেশের দিকবিদিকে। ছুটে আসে ভক্তের দল বাবার চরণে প্রণাম জানাতে। সে ধারা আজও চলছে।'

মধুসূদনের কথা শোনার পরে গার্গীর ভক্তি বেড়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি? আবার প্রণাম করল। হয়তো বা একটু বেশি সময় নিয়েই। তারপরে প্রদক্ষিণ করল। শিউলিও যোগ দিল। কাহিনী বলার সময় মধুসূদন 'অনাদি লিঙ্গের মতো' কথা ব্যবহার করেছিল। ভালভাবে নজর করে দেখলাম ত্রিশূলটি শিবলিঙ্গাকারে গৌরীপটের উপর অধিষ্ঠিত।

পাশেই সংকটমোচন হনুমানের মন্দির। হনুমান-মন্দির আমাদের দেশে নানা জায়গায় আছে। শ্রীরামচন্দ্রের মতো পবন-নন্দনও বহুপূজ্য।

হরিদ্বার-ঋষিকেশের মতো উত্তরকাশীতেও অনেক মন্দির। একাদশ রুদ্র মন্দির, পরশুরাম মন্দির, ভৈরবনাথের মন্দির, জ্ঞানেশ্বর মন্দির, কুতেতী দেবীর মন্দির ইত্যাদি। দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে যেসব তীর্থযাত্রী গঙ্গোত্রী যান, তাঁদের বড় একটা অংশই যাত্রাপথে এই উত্তরকাশীতে রাত্রিবাস করেন, এবং বিভিন্ন মন্দিরে

পুজো দিয়ে থাকেন। তাঁদের জন্য যেমন বিলাসবহুল দামী হোটেল রয়েছে, সেরকম মাঝারি ও অল্পদামের হোটেলও আছে অনেক—প্রধানত মার্কেট-অঞ্চলে। এছাড়াও আছে ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস, ট্রাভেলার্স লজ, বিড়লা ধর্মশালা, কালিকমলি ধর্মশালা, পাণ্ড[illegible] ক্ষেত্র ইত্যাদি। মকর-সংক্রান্তি উপলক্ষে উত্তরকাশীতে সপ্তাহব্যাপী মেল[illegible]

দেব[illegible] হিমালয়ের বুকে উত্তরকাশীতে অনেক মন্দির থাকবেই, কিন্তু সব মন্দিরে যাওয়া সম্ভবও নয়, ইচ্ছেও নেই। মাইলখানেক দূরে কুতেতী দেবীর মন্দিরে (উত্তরপ্রদেশ পর্যটন দফতরের এক প্রচারপত্রে 'কুট্রি দেবী' হিসাবেও উল্লেখ দেখেছি) যাওয়ার কথা মধুসূদন বলেছিল। কিন্তু সেটি এককথায় নাকচ হয়ে গেল। তার চাইতে গঙ্গার পারে বসে থাকা অনেক ভাল। শাস্ত্রেই নাকি লেখা আছে 'ভাল জিনিস' গ্রহণ করতে হয়। এবং স্ত্রীর ইচ্ছের চাইতে ভাল জিনিস আর থাকতে পারে ?

ট্যুরিস্ট বাংলোতেই শুনেছিলাম এখানেও সন্ধেবেলায় মণিকর্ণিকাঘাটে গঙ্গা-মন্দিরে গঙ্গারতি হয়। তাই হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম মণিকর্ণিকাঘাটে। কিন্তু কোথায় গঙ্গা-মন্দির ? যাঁকেই জিজ্ঞাসা করি, তিনি হাত বাড়িয়ে বলেন—এই তো সামনেই।

মাই গুডনেস ! গঙ্গা-মন্দিরকে মন্দির হিসাবে সনাক্ত করাই যে কঠিন। মণিকর্ণিকাঘাট দেখে ভাল-লাগার চাইতে মায়া বা করুণাই বেশি হলো। সন্ধে সাতটা নাগাদ না দেখলাম কোনো প্রস্তুতি, না ঘাটে কোনো দর্শনার্থী বা ভক্তের উপস্থিতি। অবস্থা দেখে, এখানকার আরতি কেমন যে হবে বুঝতেই পারছি। হরিদ্বারের গঙ্গারতি মন ভরিয়ে রেখেছে। সেই ছবিকে ম্লান হতে দেব না। অতএব মন্দির ছেড়ে ওপারে যাওয়ার জন্য ঝোলাপুলে উঠলাম।

পুরোনো কথাটা নতুন করে আর একবার বলে নেওয়া ভাল। যদিও এই অঞ্চলে, অর্থাৎ গোমুখ থেকে দেবপ্রয়োগ পর্যন্ত নদীটির নাম ভাগীরথী, আমাদের কথায় বা আলোচনায় নদীটি 'গঙ্গা' নামেও উল্লেখিত হয়ে যেতে পারে। অভ্যাসের বাইরে যাওয়া কঠিন।

ঝোলাপুলের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। নীচে ভঙ্গ-তরঙ্গে কল্লোলিনী গঙ্গা। নদীর বুকে বড় বড় পাথরের চাঁই যেরকম, ছোট ছোট সাদা নুড়িও সেরকম অনেক অংশ জুড়ে রয়েছে। বড় বড় পাথর ছুঁয়ে, ছোট ছোট নুড়ির দলকে সর্বাঙ্গ দিয়ে আলিঙ্গন করে বয়ে যাচ্ছে টলটলে জল। ভারি ভাল লাগছে।

সাঁঝবেলায় ভাগীরথীর কলধ্বনি ভাল লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু দারুণ ভাল লাগল

পাহাড়ের মাথার কাছে আগুনের শিখা। বিকেলেই শুনেছিলাম এদিকের পাহাড়ে আগুন লাগানো হয়েছে। বন-বিভাগ আগুন লাগাতেই পারে, তাই কথাটা মনে তেমনভাবে জায়গা পায়নি। তাছাড়া, দিনের আলোয় তো আর আগুন দেখা যায় না।

টহল দিয়ে ফিরে চায়ের ফরমায়েশ করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে ডানদিকের প্যাসেজ বরাবর বাঁক নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাতেই চোখ আটকে গেল। —পাহাড়ের বুকে আগুন জ্বলছে—এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত। ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের রূপরেখা অনুযায়ী উঁচু-নীচু লাইন করে। অন্ধকারের পটভূমিকায় আগুনের শিখা যেন আলোর মালা হয়ে পাহাড়কে বেষ্টন করে রেখেছে। আরো সহজ কথায়, পাহাড়ের গলায় যেন অগ্নিশিখার মালা। ছোটবেলায় মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে একবার আগুন দেখেছিলাম। সে আগুন দেখেছিলাম—নিরাপদ দূরত্বে হলেও—বেশ কাছ থেকে এবং সমতলে। তার মধ্যে কোনো রূপ খুঁজে পাইনি। হয়তো বা পাওয়ার মতো মন বা বয়স ছিল না। কিন্তু আজ বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার ওপারে, দূরে উঁচু পাহাড়ের গায়ে—একটা পাহাড় নয়, পাহাড়শ্রেণীতে—আগুনের মালার রূপই আলাদা। জ্বলন্ত আগুনের যে সুন্দর একটা রূপ আছে, এই প্রথম জানলাম।

অনেকক্ষণ রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে। ঘরের উষ্ণতায় ফিরে এলাম। ততক্ষণে গরম চা এসে গিয়েছে।

কাল রাতে দেখেছি পাহাড়ের বুকে আগুনের রূপ; আজ ভোরের আলোয় আগুন দেখা গেল না, দেখলাম মৌন-তাপসের মতো সমাধিস্থ পর্বতশ্রেণী। রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। —'কি গো দাঁড়িয়ে শোভা দেখলেই চলবে? গোছগাছ করে যে বার হয়ে পড়তে হবে।'

—'এখনও চা দিয়ে গেল না। চায়ে চুমুক না দিতে পারলে কি বার হওয়ার জন্য ফাইনাল টাচ দেওয়া যায়?'

—'এই নাও চা। এখনই ঘরে দিয়ে গেল।' গার্গী গরম চায়ের কাপ আমাদের হাতে এগিয়ে দিল।

গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে গার্গীকে বললাম—'দু-পাঁচ মিনিট দেরী হলে তো ক্ষতি নেই। পাহাড়ের কি সুন্দর শোভা—মন ভরে দেখে নে।'

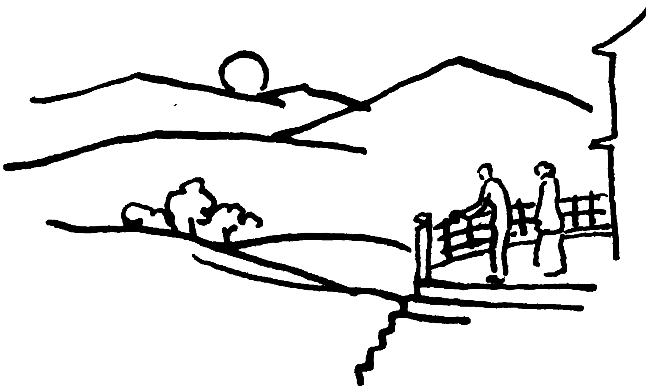
গার্গী বলল—'পথে অনেক শোভা দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে। এখন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। চরৈবেতি।'

পাশের ঘরের ভদ্রলোকও আমার মতো প্রকৃতির শোভা দেখছিলেন। শিউলি আর গার্গীর তাড়া দেখে একটু হাসলেন। এবং তারপর ধীরে ধীরে আমার কানের কাছে নিচু স্বরে বললেন —'দু-দণ্ড রয়ে-সয়ে থাকতে দেবে না। এই জন্যই বোধ হয় বলে পথে নারী বিবর্জিতা।'

গার্গী কিছু বলতে যেতেই হাতজোড় করে ভদ্রলোক বললেন—'ভোরবেলায় আর ধমক দেবেন না দিদি। আপাদের যাত্রা শুভ হোক।'

ভাললাগার আমেজ নিয়েই ভোর সাড়ে-ছটায় গাড়ি ছাড়ল। মধুসূদন অবশ্য আরো ঘণ্টাখানেক আগে রওনা হতে চেয়েছিল। আলাদাভাবে গাড়ি থাকলে বাস-ট্রেনের মতো সময়ের বেড়া থাকবে কেন? তাছাড়া এখানকার ভোর সাড়ে-ছটার অর্থ কলকাতায় ভোর সওয়া-পাঁচটা।

কলকাতায় ফেরার পর বন্ধুপত্নী বলেছিলেন—'সে কি! উত্তরকাশীতে দুদিন রইলেন, অথচ আপনরারা 'উজলি' যান নি?' স্বীকার করে নিতে হয়েছিল যে, নামটি আমি প্রথম শুনছি। তিনি জানালেন, উত্তরকাশীর খুব কাছেই, একেবারে গা-লাগোয়া উজলিতে আছে অনেক মন্দির আর আশ্রম। শান্ত-পরিবেশে তাঁর ভগবৎ-সাধনায় মগ্ন। না, আমাদের যাওয়া হয়নি। বললাম—না গিয়ে হয়তো ভালই হয়েছে; আমরা গেলে হয়তো বা সাধনায় বিঘ্ন ঘটতো। তারপর নির্লিপ্তভাবে বলেছিলাম—সারা হিমালয়ই তো তপোভূমি।





উত্তরকাশী ছাড়িয়ে

ভোরবেলায় যখন উত্তরকাশী ছাড়লাম, তখনও জনজীবন জেগে ওঠেনি। পাহাড়ি জায়গায় প্রাত্যহিকতা শুরু হয় একটু দেরীতেই। দেরীতে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার সময় অনুযায়ী—সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী নয়।

উত্তরকাশী ছাড়তে না ছাড়তেই গাঙ্গোরী। উত্তরকাশী থেকে মাত্র চার কিলোমিটার। ভাগীরথীর সংগে অসি নদীর সঙ্গম। এখান থেকে বাঁদিকে রাস্তাটি চলে গেছে ডোড়িতাল—অসি নদীর উৎপত্তিস্থল। দুর্দান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা ডোড়িতালে বহু প্রকৃতি-প্রেমিক বেড়াতে গিয়ে থাকেন।

আমি ডোড়িতালের কথা ভাবছিলাম, ঠিক তখনই মধুসূদন বলল—'বৌদি, আপনারা কিন্তু ডোড়িতাল ঘুরে আসতে পারতেন। খুব ভাল লাগত।'

শিউলির চাইতে গার্গী একপায়ে বেশি খাড়া। আমার দিকে তাকাতেই ওর চোখের কথা বুঝতে পারলাম। বললাম—'হুট করে চট-জলদি যাওয়ার মতো ব্যাপার নয়। গাড়ি তো যায় না, তাছাড়া অনেক লম্বা রাস্তা পায়ে হেঁটে যেতে হয়। তাই না মধুসূদন?'

'ঠিক তা নয় স্যার। গাঙ্গোরি থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে সাত হাজার ফুট উচ্চতায় আগোদা পর্যন্ত জিপ যেতে পারে। তারপর আগোদা থেকে ১৬ কিলোমিটার পায়ে-হাঁটা পথে প্রায় সাড়ে-দশ হাজার ফুট উচ্চতায় ডোড়িতাল। পথের দুপাশে দেওদার আর পাইন গাছ যেন গার্ড-অব অনার দিচ্ছে দিদি।' শেষটুকু গার্গীকে।

—'ইস্! গেলেই হতো। না হয় হাঁটতাম কিছুটা পথ। হিমালয় বেড়াতে এসে হাঁটার ভয় করলে চলে?'

তা' চলে না ঠিকই। যাঁরা প্রকৃত প্রকৃতি-প্রেমিক, পাহাড়-প্রেমিক, তাঁরা সুযোগ হারান না, কিন্তু সময়ের রাশ যে আমাদের টেনে ধরেছে। মধুসূদনের কথা শেষ হয়নি—'শুধু যে প্রাকৃতিক দৃশ্য তাই নয় দিদি, ডোড়িতাল গণেশের জন্মস্থান।'

শিউলি আমার দিকে তাকাল। —'সেকি গো! সেবার কেদারনাথ যাওয়ার পথে শুনলাম গৌরীকুণ্ড নাকি গণেশের জন্মস্থান। কোনটা ঠিক?'

—'আমি জানি না। দুদিন পরে হয়তো শুনবে অন্য কোনো জায়গা একই দাবি জানাচ্ছে।'

উত্তরকাশী থেকে বার হয়েই এখন অসি-ভাগীরথীর সঙ্গম পার হলাম। গতকাল উত্তরকাশীতে প্রবেশের কয়েক কিলোমিটার আগে পেয়েছিলাম বরুণা ও ভাগীরথীর সঙ্গম। জায়গাটির নাম নাকোরি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নাকোরি বাচেন্দ্রী পালের জন্মস্থান। বাচেন্দ্রী পাল প্রথম ভারতীয় মহিলা, যিনি এভারেস্ট শিখর জয় করেছেন। উত্তরকাশী আসার পথে রাস্তার বাঁদিকে একটি ফলকে কথাগুলি লেখা ছিল।

পাহাড়ের গায়ে নাম-না-জানা বেগুনি রঙের ছোট ছোট ফুল। অযত্নে ফুটলেও ফুলগুলোর হাসি ছড়িয়ে পড়ছে। অপরদিকে পথের পাশেই ক্ষেত। কিছুটা সমতল জায়গা। আমরা পৌঁছে গেলাম মানেরি, মহাভারতের যুগে যেখানে নাকি অর্জুনের সাথে কিরাতবেশী মহাদেবের যুদ্ধ হয়েছিল। হিমালয়ের প্রায় সব জায়গার সাথেই মহাভারত বা রামায়ণের কোনো-না-কোনো কাহিনী যুক্ত হয়ে আছে। বেশি আছে মহাভারতের কথা। শুনেছি উত্তরকাশীর কাছাকাছি কোথায় যেন জতুগৃহ দাহ হয়েছিল। এখানেই ছিল বারণাবত, যেখানে মাতা কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবকে রাজপ্রতিনিধি হিসাবে ধৃতরাষ্ট্র পাঠিয়েছিলেন পশুপতি উৎসবে যোগ দিতে। পশুপতি অর্থাৎ দেবাদিদেব মহাদেবের বার্ষিক পূজা উৎসবের বিরাট আয়োজন করতো পার্বত্য জনজাতি গোষ্ঠী। বিপুল সমাবেশে এবং যথাযথ জাঁকজমকে হিমালয়ের এই পাহাড় অরণ্য অংশ জমজমাট হয়ে উঠত। হস্তিনাপুর থেকে দূরে, এই বারণাবতে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করার জন্য শকুনি-দুর্যোধনের কুটিল নিষ্ঠুর নির্দেশে তাদের বিশ্বাসভাজন মন্ত্রী পুরোচন তার কারিগর দিয়ে শন, ধুনা, এবং মাটির সাথে প্রচুর ঘি, তেল এবং জতু (গালা) দিয়ে তৈরি করল এক আপাত দৃষ্টিনন্দন গৃহ—জতুগৃহ। সেই জতুগৃহে আগুন লাগা এবং সুড়ঙ্গপথে মাতা কুন্তীকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডবের পলায়ন—সেটা অন্য কাহিনী।

বারণাবতের অবস্থান ঠিক কোথায় এবং কোথায় সেই জতুগৃহ ছিল তা আজ নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়, তবুও অনেকে নাকি সে স্থান দেখতে যান। মূল সড়কের উপরে নয়, বেশ কিছুটা হাঁটতে হয়। কোথায় সেই স্থান জানি না, তবুও কল্পনায় অনুমান করে নিতে চাই পাণ্ডুপুত্রদের জন্য সেই বাসভবন নির্মিত হয়েছিল পুণ্যভাগীরথী তীরে। তাই ডানদিকে ভাগীরথী-পানে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু আজ কোনোখানে লেশ, নাহি অবশেষ সেদিনের কোনো চিহ্ন। তবুও একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে স্থানীয় গাইডরা জতুগৃহের কাহিনী উগরে দেন। কথাটা আমার নয়, গতরাতে যাত্রী অতিথি নিবাসের ম্যানেজারের কাছে শোনা। কিন্তু এখন মানেরিতে নতুনযুগের ছোঁয়া। গঙ্গার বুকে বাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

এখনও রোদ নরম। নদী, পাহাড়, গাছ-গাছালি, মাঝে মাঝে দশ-বিশটা বাড়ির গ্রাম ও তার লাগোয়া চিলতে জমির উপর সূর্যের স্নেহদৃষ্টি। মিঠে রোদের সজীব হাসিতে চারিদিক প্রাণময়। গত দুদিনের মতো গরম না হলেই ভাল।

মাঝে মাঝে গাড়ির গতি রুদ্ধ হচ্ছে। শ'-দেড়শ' ভেড়ার পাল নিয়ে চলেছে পাহাড়ি ছেলে। মিলিটারির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ভেড়ার চাহিদাও বেড়েছে।

এখানকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা চাষবাস, পশুচারণ এবং জঙ্গল-সম্পদ। তবে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ফলে এদের জীবন-ধারণেও দ্রুত পরিবর্তন আসছে। নগরসভ্যতা আর দূরে নেই। যোগাযোগ সহজতর হয়েছে এবং অনেকেই ছুটছে কাছে-দূরের শহরে অন্যতর জীবিকার জন্য। এদের করণীয়ই বা কি আছে? পায়ে হেঁটে তীর্থযাত্রার দিনে এদের বাবা কাকাদের দল যাত্রীদের মাল বয়েছে, প্রয়োজনীয় সম্ভার জুগিয়েছে, কয়েক কিলোমিটার অন্তর-অন্তর চটিতে যাত্রীদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছে। কেউ গাইডের কাজ করেছে, অনেকে ঘোড়া চালিয়েছে, ডাণ্ডি-কাণ্ডিতে যাত্রীদের নিয়ে ছুটেছে। এখন পাহাড় কেটে, পাথর ভেঙে, নদীর বুকে সেতু তৈরি করে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত পাকা রাস্তা চলে গিয়েছে। পথচারী যাত্রীদের দিন শেষ। এরা কি-ই বা করবে? জীবিকাহীন হয়ে তো পেট চালানো যায় না, পরিবার পালন করা যায় না। পাকা সড়কের উপর দিয়ে বেগে ধাবমান গাড়ি ও বাসের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে এবং দিনবদলের হাওয়ার সাথে জীবনধারণের জন্য জীবিকা পালটেছে।





গঙ্গোত্রীর পথে

ভাটোয়ারি এসে পৌঁছতে সময় লাগল ঠিক একঘণ্টা—উত্তরকাশী থেকে ঠিক একঘণ্টার পথ। পাহাড়ি-পথে এটাই স্বাভাবিক গতি। এককালের ছোট জনপদ এখন শহরের রূপ নিতে চলেছে।

এখানে কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিলাম। গঙ্গোত্রীতে যে পি. ডবলু. ডি. বাংলো আছে, সেটির সংরক্ষণ করেন এখানকার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়র। কলকাতা থেকে চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু উত্তর পাইনি (কিংবা পৌঁছয়নি)। যোগাযোগ করে জানা গেল গঙ্গোত্রীর বাংলোর অবস্থা খারাপ, তাই সংরক্ষণের প্রশ্ন উঠছে না। অতএব—

অতএব বিফল মনোরথ হতে হলো। কিন্তু চা-পানে তো বাধা নেই। শিউলি অমত জানিয়েছিল, কিন্তু আমরা ভোটে হারিয়ে দিলাম। স্বীকার করতেই হবে, এত বাজে চা তৈরি করা বেশ কঠিন।

এগিয়ে চলেছি খোশ-মেজাজে। না থেমে পার হয়ে গেলাম গাংনানী। এটি এখন একটি সাধারণ পার্বত্য জনপদ, কিন্তু পায়ে-চলার দিনে বিশ্রাম ও রাত্রিবাসের জন্য এটি ছিল অতি ব্যস্ত এক চটি। এখানে রাত্রিবাস করে উষ্ণকুণ্ডে স্নান সেরে যাত্রীদল গঙ্গোত্রীর পথে রওনা হতেন। কালো পীচের পাকা সড়ক আজকের যাত্রীদের ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। আমরাও তাই করছি। থামার সময় কোথায়?

না, থামার সময় নেই, প্রয়োজনও নেই। আমরা এগিয়ে চলেছি হিমালয়ের আরো অন্দরমহলের দিকে। কিছু অন্তর-অন্তর ধস্ নেমেছে, কিন্তু তা' বলে পথ বন্ধ হয়নি। ইঞ্জিনীয়র এবং কর্মীদল তাঁদের কাজ করে গেছেন যথাযথভাবে। একটু সতর্ক হয়ে পার হয়ে গেলাম বিপদজ্জনক অংশগুলো।

পর পর অনেকগুলো বাঁক। চুল-কাঁটা বাঁকগুলো (U-turn) পার হওয়ার সময় ভয়মেশানো ভাল লাগে। ভাগীরথী কোথাও উপলমুখর, উচ্ছল-উদ্বেলিত, কোথাও শান্ত। কোথাও শীর্ণা, কোথাও বিস্তৃত। কোথাও দুপাশের পাহাড় থেকে বড় বড় পাথরের চাঁই নেমে নদীপথ সংকীর্ণ করেছে, কোথাও খাড়াই পাহাড়। কোথাও বা নদী বহু নিচে। বেশ কিছু ঝোরা যাত্রাপথের আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

হরিদ্বার থেকে সুখি ২৩৪ কিলোমিটার। গাংনানীর পর থেকেই চড়াই শুরু হয়েছিলো—বেশ দুরন্ত চড়াই। গাংনানীর উচ্চতা ৬১০০ ফুট এবং সুখির উচ্চতা ৯০০০ ফুট। গাংনানী থেকে সুখির দূরত্ব ১৪ কিলোমিটার। এইটুকু দূরত্বে আনুভূমিক পার্থক্য প্রায় তিন হাজার ফুট। খাড়াইয়ের বহর কতটা তা সহজেই অনুমেয়। আমরা মারুতির আরামে চেপে ছুটছি, তাই তেমন কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না। বরঞ্চ পাহাড়ি পথে বিপজ্জনক অথচ চোখ-ভরে-দেখতে ভাল লাগা আঁকাবাঁকা মোড় নিতে নিতে উপরে উঠতে রোমঞ্চই লাগে। পায়ে-হাঁটা পথের দিনে এই প্রাণঘাতী চড়াই ভাঙতে পথচারীদের অবর্ণনীয় কষ্টের কথা ভাবতেই পারি না।

পাহাড়ের বুকে দেওদার পাইনের সমারোহ। এক জায়গায় বাঁশ-ঝাড় দেখলাম বলেও যেন মনে পড়ছে। পাখির ঝাঁক সেরকমভাবে কোথাও চোখে পড়ে নি। মাঝে মাঝে রঙ-বেরঙের ছোট ছোট পাহাড়ি ফুলের হাসি। সেই হাসির সাথে মিশে গেল উল্টোদিক থেকে আসা কয়েকটি পাহাড়ি মেয়ের প্রাণ-খোলা হাসি।

এসব অঞ্চলে লোকালয় নগণ্য। এখান থেকে হিমালয়ের রূপ আরো ভাল করে চোখে পড়ল। পাহাড়ের কোলে ইউক্যালিপটাস, চীর, দেওদারের ফাঁকে ফাঁকে আলোর উঁকি-ঝুঁকি। কোথাও স্নিগ্ধ শ্যামলিমা। নীল আকাশ আর পাহাড়ের ঢেউগুলো মিলে মিশে একাকার।

সুখির চড়াইয়ের পরেই উৎরাই। চুল-কাঁটা বাঁক ভেঙে সাত কিলোমিটার দূরে হাজার ফুট নিচে এসে পৌঁছলাম। ঝালা।

পাহাড়ি-পথে তৈরি চায়ের স্বাদ সাধারণত ভাল হয় না, কিন্তু এখানে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ভাল লাগল। একটু জমিয়ে বসে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার জন্য বোধ হয় প্রাণ আনচান করেছিল। বাইরে খুঁটির উপর পাটাতন পাতা, চেয়ারও আছে। আরাম করে জমিয়ে বসলাম। মধুসূদন গাড়ির বনেট খুলে দিল।

আপেল ও নাসপাতি বাগানের জন্য ঝালার নাম আছে। আমরা যে দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম, তারই গায়ে-লাগানো আপেল বাগান। গাছে সবেমাত্র ফল এসেছে-আকারে পাতিলেবুর চাইতে কিছু বড়। খাওয়ার প্রশ্নই নেই, তবুও গাছ থেকে আপেল পাড়ছি এই আনন্দেই শিউলি কয়েকটা আপেল তুলে ফেলল। কিছু আগে রাস্তার পাশের গাছ থেকে পাড়া হয়েছে আমাদের-না-জানা ফল। উচ্চারণ কুমানি না খুবানি ঠিক বুঝতে পারলাম না। পাকা ফলের রঙ লালচে-কমলা। স্বাদ কিঞ্চিৎ টকের ছোঁয়া-লাগা মিষ্টির দিকে। ওদের ভাল লাগেনি, কিন্তু আমি তো বেশ তারিয়ে খেয়েছি। শুধু তাই নয়, ফিরতি পথে মুসৌরি যেতে বারকোটের কাছাকাছি অপরিণত আখরোট এবং দেরাদুনে মা আনন্দময়ীর আশ্রমের গাছ থেকে পাকা লিচু পাড়ার অনাবিল ছেলেমানুষি আনন্দও ওরা পেয়েছে।

•

ভাগীরথী ছিল আমাদের ডানদিকে। এবারে সেতু পার হতেই ভাগীরথী জায়গা নিল বাঁদিকে। ঝালা থেকে হরসিল মাত্র ছয় কিলোমিটার। ঝালার আগে থেকেই ভাগীরথীর বিস্তৃতি বড় হতে আরম্ভ করেছে। হরসিলের পরেও তাই।

গঙ্গোত্রীর পথে হরসিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। বাঁহাতে ভাগীরথী তীরে লোকালয়, ঘরবাড়ি, মিলিটারি-ছাউনি। আছে আপেল বাগান। ডানদিকে নগশ্রেণী, তারই বুক চিরে নাচের ছন্দে নেমে আসছে ঝোরা। হরসিলের অনেক জায়গায় রাজকাপুরের 'রাম তেরী গঙ্গা ময়লী' ছবিটির শুটিং হয়েছিল। দুজন মহিলা শ্রোতা পেয়ে মধুসূদন শুটিংয়ের গল্প শুনিয়ে যাচ্ছিল। এই ঝর্ণার বুক থেকেই নাকি মন্দাকিনী ভরা গাগরি নিয়ে নেমে এসেছিল। আর একটা জায়গা দেখিয়ে জানালো মন্দাকিনীর স্নানের শুটিং সেখানে হয়েছিল। সমগ্র উপত্যকাটির যেদিকেই চোখ ফেরানো যায় সেদিকই সুন্দর। পাহাড়, নদী, ঝর্ণা, পাইন-দেওদারের বনানী, ছবির মতো উপত্যকা, শ্যামলিমা, ভাগীরথীর মাতৃক্রোড়—সব কিছু মিলে মিশে প্রাকৃতিক দৃশ্য এত নয়ন-মনোহর যে চোখ ফেরানো যায় না।

ঝর্ণার পাশে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদেরও দাঁড়াতে হলো। রাজকাপুর তাঁর নায়িকার ছবি তুলতে পারেন, কিন্তু আমাদের মতো যাত্রীদের সাথে যাঁরা আছেন, তাঁরা রূপালি-পর্দার নায়িকা না হতে পারেন, গৃহ-স্বর্গের নায়িকা তো বটে। অতএব এখানে আমরা সকলেই ছবি তুললাম মনের আশ মিটিয়ে।

এ পথে আসতে আসতে একটা কথা মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল। কেদারনাথ বা বদরিনাথ যাওয়ার পথে অনেক প্রয়াগ পেয়েছি—ভাগীরথী-অলকানন্দা সঙ্গমে দেবপ্রয়াগ, অলকানন্দা-মন্দাকিনী সঙ্গমে রুদ্রপ্রয়াগ, মন্দাকিনী-শোনগঙ্গা সঙ্গমে শোনপ্রয়াগ, অলকানন্দ-পিণ্ডারিগঙ্গা (কর্ণগঙ্গা) সঙ্গমে কর্ণপ্রয়াগ,

অলকানন্দা-নন্দাকিনী সঙ্গমে নন্দপ্রয়াগ, অলকানন্দা-বিষ্ণুগঙ্গা সঙ্গমে বিষ্ণুপ্রয়াগ। কিন্তু এপথে কোনো নামী প্রয়াগ পেলাম না; গঙ্গোত্রী পর্যন্তও নয়। শুনেছি ভাটোয়ারির আগের নাম ভাস্করপ্রয়াগ। ভাবতেও কেমন লাগে ভাস্করপ্রয়াগের অপভ্রংশ ভাটোয়ারি। এবং হরসিলের প্রাচীন নাম হরিপ্রয়াগ। এই দুই জায়গায় হিমালয়ের কোল থেকে নেমে এসে দুটি নদী ভাগীরথীর সাথে মিলিত হয়েছে বটে, তবে নামী নদী নয়। যতদূর মনে পড়ছে মধুসূদন নদী দুটোর নামও বলেছিল, কিন্তু এখন চট্ করে সে নাম খেয়াল করতে পারছি না। এপথে নামী উপনদীও নেই, প্রয়াগও নেই।

ঝোরার পাশে বসেছিলাম। প্রয়াগ-প্রসঙ্গ শিউলিই তুলেছিল। গার্গী বলল 'আমার একটা কথা মনে হচ্ছে; বুঝতে পারছি না বলা ঠিক হবে কি না?' প্রথমে আমার দিকে, তারপর শিউলির দিকে তাকাল। শিউলি বলল—'বলেই ফেল্ কি মনে হচ্ছে?'

একটু থেমে অনেকটা স্বগোতোক্তির মতোই গার্গী বলল—'হরিপ্রয়াগের সঙ্গমে কি হরির নামে কোনো পবিত্র শিলা ছিল? তার থেকেই কি বর্তমান নাম হরি-শিলা এবং 'হরি-শিলা' থেকে হরসিল?'

শিউলি বলল—'গার্গী! তোমার বিশ্লেষণ তো বেশ সুন্দর। —হ্যাঁ, হলেও হতে পারে। কি গো তাই নাকি?'

আমি শিউলির কথারই প্রতিধ্বনি করলাম-যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ। হলেও হতে পারে। মধুসূদন কিছু বলতে পারল না। গঙ্গোত্রী গিয়ে বিশদভাবে জানার চেষ্টা করতে হবে।

ব্যাগ খুলে গার্গী শুকনো খাবার হাতে-হাতে এগিয়ে দিল। ঝোরার পাশে শরীর এলিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে আছি। বেশ কিছু তীর্থযাত্রী পদব্রজেই গঙ্গোত্রী চলেছেন। যে দল চলেছে, সেদল সম্ভবত রাজস্থানী। পোষাকে গাঢ় লাল-হলুদের আধিক্য। এঁদের অনেকেরই বিশ্বাস পায়ে হেঁটে তীর্থদর্শন না করলে পুণ্যের কলস ভরে ওঠে না। অনেকের পায়েই কেড্স নেই, চটি পায়েই চলেছেন।

একদল যাত্রী ঝর্ণার পাশেই সাময়িক যাত্রা-বিরতি করেছে। তিনটি বড় পাথর সাজিয়ে উনুন তৈরি করে একপাশে রান্না চাপানো হয়েছে। ধোঁয়ার মধ্যে কালো অ্যালুমিনিয়াম ডেকচিতে চেপেছে মিক্সড ভেজিটেবল। তৈরি হচ্ছে চাপাটি। কয়েকজন মাহিলা একটু উপরের দিকে স্নান করছে। সংকোচের বালাই কম। স্নান করতে করতে আর পোষাক বদল করতে গিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

লংকা।। গাড়ির কাগজপত্র চেক হলো। সেতু পার হওয়ার জন্য টোল-ট্যাক্স দিতে হলো। গঙ্গা এখন ডানদিকে—একেবারে গঙ্গোত্রী হয়ে গোমুখ পর্যন্ত।

লংকা এককালের ব্যস্ত চটি। হরসিল থেকে জংলা হয়ে লংকা পর্যন্ত নদী ও পাহাড়ের মধ্যে রাস্তা দারুণরকমের সুন্দর। স্টিয়ারিঙে হাত রেখে অ্যাকসিলারেটারের উপর আপন-আপনিই চাপ পড়ে যায়।

লংকা থেকে ভৈরবচটি মাত্র তিন কিলোমিটার। অনেকদিন পর্যন্ত এই অংশটুকু মোটরেবল করা যায়নি। এখানেও এক যমুনা নদী ভাগীরথীতে পড়েছে। লংকা থেকে ভৈরবঘাঁটি পর্যন্ত ছিল পদযাত্রা। ওখান থেকে আবার বাস কিংবা জিপ পাওয়া যেত।

একটু পরেই দারুণ রকমের দুর্দান্ত দৃশ্য। রাস্তা বাঁদিকে বৃত্তাকারে বাঁক নিয়েছে, কিন্তু ভাগীরথী নদী সড়কবৃত্তের স্পর্শক (tangent) হয়ে বরাবর সোজা চলে গিয়েছে। একটু উল্টো বলা হলো, কেন না আমরা নদীপ্রবাহের উল্টোদিকে চলেছি। আসলে ভাগীরথী সোজা ট্যানজেন্টের মতো এসে সড়কবৃত্তের সাথে যুক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, দুপাশের পাথরের খাড়াই পাহাড় ভেদ করে প্রচণ্ড বেগে নেমে আসছে। উথালি-পাথালি বন্য সৌন্দর্যের সাথে ছন্দময় গর্জন। বড় বড় পাথরে প্রতিহত হয়ে জলের ছটা হাত তুলছে আকাশপানে, সাদা ফেনা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। লিখে বা বলে বোঝাবার নয়—দেখে অনুভব করার দৃশ্য।

গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলাম। প্রাণভরে—। আচ্ছা, একেই কি সৌন্দর্যসুধা পান করা বলে? কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের বিলীন করে দিলাম।

লংকা থেকে উৎরাই পথে নামছি। তিন কিলোমিটার দূরে ভৈরবঘাঁটি—স্থানীয় উচ্চারণে ভৈঁরোঘাটি। গঙ্গোত্রীর আগে শেষ জনপদ। (উত্তরপ্রদেশ প্রর্যটন দফতরের কাগজপত্রে দুজায়গায় দুরকম উচ্চতার উল্লেখ দেখছি। এক জায়গায় লেখা আছে ২৭৪৩.২ মিটার এবং অন্য জায়গায় ২৬৫০ মিটার অর্থাৎ যথাক্রমে প্রায় ন'হাজার ও আটহাজার ছ'শ নব্বই ফুট।) এখানে ভৈরবনাথের মন্দির আছে। অনেক তীর্থযাত্রী ভৈরবনাথের মন্দিরে পুজো দিয়ে গঙ্গোত্রী যাত্রা শুরু করেন। ভৈরবনাথের নামেই এই শেষ ঘাঁটি। গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রী—দুই তীর্থস্থানের আগেই আছে ভৈরবনাথের মন্দির। এখানে ভাগরীরথীর সাথে মিশেছে জড় গঙ্গা বা জাহ্নবী নদী।

ভাগীরথী ডান হাতে। চড়াই পথে উঠছি। ভৈরবঘাঁটি থেকে গঙ্গোত্রী মাত্র নয় কিলোমিটার। কেদারনাথ বা বদরিনাথের পথে আছে 'দেও-দেখানি'—অর্থাৎ দূরে যে স্থান থেকে প্রথম কেদারনাথ-বদরিনাথের মন্দির দেখা যায়। পদযাত্রীরা ক্লান্তপথে যেতে যেতে যখন উৎসাহ হারিয়ে ফেলার মুখে, যখন শরীর আর টানতে পারেন

না, তখন দূর থেকে মন্দির শীর্ষ চোখে পড়তেই উৎসাহ ফিরে পেতেন। ক্লান্তি এবং জড়িমা ফেলে রেখে নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু করতেন। মুখে থাকত 'জয় কেদারনাথ' কিংবা 'জয় বদরিবিশাল' ধ্বনি। গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর উপর লেখা কোনো বইতে এই পথে 'দেও-দেখানির' কথা পড়িনি। মধুসূদনও কিছু বলতে পারল না।

রোদের তেজ বাড়তে আরম্ভ করেছে। উল্টোদিক থেকে বেশ কয়েকটা প্রাইভেট ট্রাভেল এজেন্সির বাস বার হয়ে গেল। গঙ্গামায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে কয়েকদল যাত্রী ফিরে যাচ্ছেন। আমাদের গাড়িকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজন গলা ছেড়ে হাঁক দিলেন—'জয় গঙ্গা মাইকী।' আমরাও চলতি-গাড়ি থেকে গলা মেলালাম।

গঙ্গোত্রী আর মাত্র ছয় কিলোমিটার।





গঙ্গোত্রীর পুণ্যভূমিতে

অবশেষে একটা যাত্রার সাময়িক বিরতি। এগারোটা নাগাদ গঙ্গোত্রী এসে পৌঁছলাম। প্রথমেই যা ভাল লাগল, তা' হলো ভাগীরথীর গর্জন। দু পাশে উঁচু ও বিরাট পাথরের জটাজালের ফাঁক দিয়ে পতিতপাবনী নেমে আসছে। স্থানীয় লোকেরা বলেন এটাই শিবের জটাজাল। এখানেই শিব গঙ্গাকে ধারণ করেছিলেন এবং পরে জটা থেকে মুক্ত করেছিলেন।

উত্তরাখণ্ডের চারধামের অন্যতম গঙ্গোত্রী। বদরিনাথের মতো এখানেও সড়কযোগে সরাসরি গাড়িতে আসা যায় বলে যাত্রী সমাগম প্রচুর। তার উপর আজ গঙ্গা-দশহরা। অর্থাৎ আজকের পুণ্যতিথিতে বিষ্ণুলোক থেকে গঙ্গা মর্তাবরণ করেছিলেন। তাই জনসমাগম বেশি। অবশ্য যাত্রীদলের বড় একটা অংশ গতকাল রাত্রিবাস করে ঊষালগ্নে পুণ্যস্নান সেরে সকালে মা-গঙ্গার পুজো দিয়ে ফিরে গেছেন। বেশিরভাগ যাত্রীই গোমুখ যান না।

গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের (GMVN) যাত্রী-বিশ্রাম নিবাসে (Tourist Rest House) স্থানাভাব। পি. ডবলু. ডি. বাংলোর অবস্থা ভাল না থাকায় সংরক্ষণ হচ্ছে না। ধর্মশালা আমাদের পছন্দের কোটায় নেই। অন্যান্য জায়গা তেমন পছন্দ হলো না। তবুও মোটামুটি ভাল জায়গায় পেয়ে গেলাম গঙ্গা-নিকেতনে। লাগোয়া উন্মুক্ত জায়গায় গার্ডেন-আম্ব্রেলার নিচে খাবার ব্যবস্থা। খাওয়া তেমন সুবিধার না হলেও অবস্থানটি লোভনীয়। গঙ্গামন্দিরের কাছেই যে সেতুটি, তার ঠিক মুখেই

এবং একেবারে ভাগীরথীর উপরেই। রেলিঙে ভর করে দাঁড়ালে ভাগীরথীর জল ছলকে আলিঙ্গন করতে আসে।

একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত বাস বা গাড়ি আসতে দেয়। 'অপনা হাথ জগন্নাথ' না হলে লটবহর বইবার জন্য কুলি আছে। থাকবার জায়গার ব্যবস্থা করে মালপত্তর আনিয়ে গোছগাছের পর দুপুরের খাওয়া সারতে একটু সময়ই নিলাম। এখনই মন্দিরে ছুটব না। দুপুর বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে যাব।

চারিদিকে পাহাড়ের মধ্যে গঙ্গোত্রী একটা ছোট উপত্যকা—ভাগীরথী ও কেদার গঙ্গার সঙ্গম। ভৌগোলিক অবস্থান ৩০°৫৯' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৮°৫৯' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মিলিত বিন্দুতে। স্থানটির উচ্চতা ৩১৪০ মিটার (১০,৩০০ ফুট), কিংবা ৩০৪৮ মিটার (৯৯৯৭ ফুট) কিংবা ৩২০০.২ মিটার (১০৪৯৭ ফুট) কিংবা ৯৯৫০ ফুট। "কিংবা" কথাটা ব্যবহার করতে হলো এজন্য যে, উত্তরপ্রদেশ পর্যটন দফতরের বিভিন্ন প্রচার পুস্তিকায়-পত্রে বিভিন্ন উচ্চতা দেওয়া হয়েছে। শেষের 'উচ্চতাটির' উল্লেখ আছে উমাপ্রসাদ মুখার্জির গঙ্গাবতরণ বইটিতে। বিশ্বকোষে উল্লেখ করা হয়েছে ৩৫৯৬ মিটার অর্থাৎ ১১৯৯৫ ফুট। হরিদ্বার থেকে গঙ্গোত্রীর দূরত্ব ২৭৩ কিলোমিটার এবং জেলাসদর উত্তরকাশী থেকে ৯৭ কিলোমিটার। এই দূরত্ব প্রসঙ্গেও সব পুস্তিকা-প্রচারপত্র একমত নয়।

দুপুরে ছোট একটা ঘুম দিয়ে বিকেল পাঁচটা নাগাদ মন্দিরে এলাম। যথারীতি পথের ধারে ভিক্ষাপ্রার্থীর সারি, যার মধ্যে কুষ্ঠরোগীও চোখে পড়ল।

অতি সাধারণ চেহারার মন্দির। প্রায় পূর্বমুখী, গোমুখের দিকে মুখ করা। আজ পুজো দেওয়া হবে না। আগামীকাল গোমুখ যাব, পরশু বিকেলে ফিরব এবং তার পরদিন সকালে পুজো দিয়ে গঙ্গোত্রী ছাড়ব।

শুনেছিলাম গঙ্গামায়ের দ্বার যাত্রীদের দর্শনের জন্য সারাদিনই উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু মন্দিরের বাইরে বড় বড় করেই লেখা দেখলাম দর্শনের সময় সকাল ন'টা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত। অথচ, বিকেল পাঁচটার পরেও আমরা দর্শন পেলাম।

মন্দিরের মধ্যে মা গঙ্গা ছাড়াও গণেশসহ অন্যান্য দেবীরাও আছেন। আজ এসেছি শুধু গঙ্গারতি দেখতে। তার আগে মাকে প্রণাম জানালাম। গোমুখ থেকে ফেরার পরে পুজো দেব। গঙ্গার ঘাটে নেমে চোখে-মুখে জলের ছোঁয়া নিলাম। ঘাটের মুখেই 'ভগীরথ শিলা', যেখানে বসে ভগীরথ তপস্যা করেছিলেন।

আগামীকাল গোমুখের উদ্দেশে রওনা হব। পলিথিনের দুটো ছোট মুখ-ঢাকা

পাত্র কেনা হলো গোমুখ থেকে পুণ্যবারি নিয়ে আসার জন্য। এবং তিনটে লাঠি, অর্থাৎ ওয়াকিং স্টিক ভাড়া করা হলো। নেওয়ার সময় পুরো দাম দিয়ে যেতে হয় এবং ফিরে আসার পরে ফেরৎ দিলে, ভাড়া বাবদ এক টাকা কেটে রেখে বাকি টাকা ফেরৎ দিয়ে দেয়।

দোকানী নেহাৎই অল্পবয়সী। অন্যান্য টুকটাক জিনিস কেনা হলো। দাম একটু বেশি। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। বছরের মাসছয়েক এরা ব্যবসা করতে পারে। বাকি ছ'মাস কেদারবদরির মতো প্রবল ঠাণ্ডা ও বরফের জন্য মন্দির দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। মন্দির দ্বার রুদ্ধ মানেই যাত্রী সমাগম একেবারেই বন্ধ, ফলে বেচাকেনারও ইতি।

মহিলাদের সহজ হওয়ার প্রবণতা আছে। তার উপর গার্গী এবং শিউলির হিন্দি ভাষার উপর অপরূপ রকমের দখলের ক্যাটালিসিস আছে।

—'তুমারা দোকানমে সব জিনিসকা বহুৎ দাম হ্যায়। হামলোগ তো একেবারে ফতুর হো যায়গা।'

—'ন্যহী দিদি। গঙ্গা মাই আপকো সদা সুখী রখে। হ্যঁমে তো বাহ্‌রসে স্যর সামান লানা প্যড়তা। কিমৎ তো থোড়া-বহুৎ বঢ়ী যাতা।'

—'তা বোলকে এতনা জেয়াদা দাম হোগা?'

—'ভাবীজি, হ্যমরা বিজনেস তো সিফ' ছে-মহ্‌নাকে লিয়ে। ইসলিয়ে থোড়া নাফা তো র‍্যখনাহী পঢ়তা।'

এর পরে এদের কথা নানা খাতে বইতে লাগল। বাড়িতে কে কে আছে, শীতের ছ'মাস এদের জীবিকা কি? এখানকার কোন উৎসব বড়? বেশি যাত্রী কখন আসে—কোন প্রদেশ থেকে আসে? অন্যান্য বছরেও কি এরকম গরম পড়ে? ইত্যাদি প্রভৃতি।

ওদের অপরূপ হিন্দিতে কথাবার্তায় আমাদের নীট লাভ তিন কাপ গরম চা এবং দোকানির লাভ অতিরিক্ত বিক্রি। না-হলেও চলবে সেরকম জিনিসও কেনা হলো। একটা কথা আমি জানতে চাইলাম। শীতের শুরুতে মন্দির দ্বার যখন বন্ধ হয়ে যায়, দোকানপাট বন্ধ করে দোকানিরা নেমে যান, তখনও তো নিশ্চয়ই সব মালপত্তর বিক্রি হয়ে যায় না। তখন কি তাঁরা অবিক্রীত সামগ্রী নিয়ে নিচে নেমে যান, না সেসব জিনিস দোকানেই পড়ে থাকে? কোনো স্থানীয় লোকের হেফাজতে কি-তা' রেখে যাওয়া হয়?

দোকানি-ছেলেটি যা বলল তার সার এই, আজকাল পরিবহণ ব্যবস্থার দারুণ উন্নতি হওয়ার ফলে সব দোকানিই সাধারণত পড়ে-থাকা মালপত্র ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তবে অনেক জিনিস দোকানে তালা-বন্ধ অবস্থায় রেখে যাওয়া হয়।

—'কিন্তু ছমাস পরে কি সেগুলো নষ্ট হয়ে যায় না?'

—'নষ্ট হবে কেন শেঠজি? তখনও তো সবকিছুই বরফ -ঢাকা থাকে—অর্থাৎ প্রকৃতিই স্বাভাবিক ফ্রিজের কাজ করে। সবকিছুই তাজা থাকে।

দোকান থেকে ওঠার আগে ওরা অবশ্য 'সুক্রিয়া' জানাতে ভোলেনি। দোকানের উল্টোদিকে মন্দির-কমিটির ধর্মশালা। এখানে উঠেছে প্রধানত দেহাত থেকে আসা যাত্রীদল। কয়েকজন বয়স্ক বাঙালি পুরুষ-মহিলাকেও দেখলাম।

পায়ে পায়ে বাস-স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেলাম। দুপাশে অস্থায়ী দোকান ও হোটেলের সারি। হোটেল মানে ছাউনির নিচে ভাজা-ভুজি, চাপাটি-সবজি এবং লাড্ডু। অধিকাংশ যাত্রীদের খাবার জায়গা এই সব ছাউনি। তীর্থযাত্রায় এরা এই ধরনেই অভ্যস্থ। বহুদিনের বাসনা পূরণ করার জন্য কিংবা মানত রক্ষা করার জন্য স্বল্প সঞ্চয় নিয়েই এরা বার হয়ে পড়েন। ধর্মশালায় জায়গা পেলে ভাল, নয় তো ধর্মশালার বারান্দায়, কিংবা কোনো দোকানের দাওয়াতে আশ্রয় খুঁজে নেন। আজকাল তবুও তো অনেক ভাল থাকার জায়গা হয়েছে এবং হচ্ছে, কিন্তু তখনকার দিনে এছাড়া তো আর কোন সুবিধাই ছিল না। দিন আনা-দিন খাওয়া যাত্রী সেকালেও যেমন ছিল, আজও তেমন আছে।

কয়েক কদম এগিয়ে যেতেই বাস-স্ট্যান্ড। স্ট্যান্ডের বাঁদিকের (মন্দিরের দিকে মুখ করলে ডানদিকের) সিঁড়ি দিয়ে নেমে পুলিশ-চৌকি পাশে রেখে আরো কয়েক পা নামলেই দ্বিতীয় সেতুটি যার ওপারেই গাড়োয়াল মণ্ডল-বিকাশ-নিগমের যাত্রী-বিশ্রাম-নিবাস (Tourist Rest House)।

সেতু পার হয়ে ওপারে গেলাম। ঠিক উজানেই সূর্যকুণ্ড শিলা। তার উপর দিয়ে প্রচণ্ড নিনাদে জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে নেমে আসছে ভাগীরথী গঙ্গা। সূর্যকুণ্ড জলপ্রপাত। শুধু প্রবল তোড়ই নয়, সঙ্গে কান-ফাটানো কিন্তু মন-ভরানো গর্জন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বিশালাকায় এক শিলার উপর। চারিদিকে সূক্ষ্ম জলকণা ছড়িয়ে পড়ছে। আরো কয়েকজন ওখানে দাঁড়িয়ে প্রপাত দেখছেন। তাঁদেরই একজন সঙ্গীদের বলছিলেন ঐ পাথরটিই নাকি 'ভগীরথ শিলা', যার উপর বসে মা-গঙ্গাকে ধরাধামে নিয়ে আসার জন্য ভগীরথ তপস্যা করেছিলেন।

গার্গী আমার দিকে তাকাল। শিউলি বলল—'তা' কেমন করে হবে গো? গঙ্গা-মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে যে চত্বর, সেখানেই তো 'ভগীরথ-শিলা' দেখলাম। ঐ শিলার উপর ছোট ভগীরথ-মন্দিরও তো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'

আমি বললাম—'যদি ভগীরথ কাহিনীর সাথে সেচ পরিকল্পনার কোনো যোগ না থাকে—'

—'সেটা আবার কি ?'

—'সে আলোচনা পরে করব।—যদি চলতি বিশ্বাস অনুযায়ী কাহিনীটি নেহাৎই সগর-সন্তানদের উদ্ধারের পৌরাণিক কাহিনী হয়, তাহলে গঙ্গা-মন্দিরের কাছের শিলাটিই 'ভগীরথ-শিলা' হওয়াই স্বাভাবিক। এবং স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, মা-গঙ্গার মূর্তি স্থাপন করে ঐ শিলায় বসে ভগীরথ তপস্যা করেছিলেন। অপরপক্ষে, এখানে এই প্রপাতের নীচের শিলায় তাঁর অবস্থান হলে তো প্রবল তোড়ে তিনি ভেসে যেতেন। নয় কি ?'

গার্গী বলল ঐটুকু গরমিল ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। আসল কথা হলো বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস—যা তর্কাতীত।

—'ঠিক আছে। তবে তাই হোক'—শিউলির মেনে নেওয়া—'তর্ক ছেড়ে দিয়ে সেই বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরছি।'

—'তাছাড়া, আরো একটা সহজ সমাধান আছে। এই প্রপাতটাকেই মা-গঙ্গার প্রতীক-মর্তাবতরণ' হিসাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে।' এটা আমার সমাধান। ওরা দুজনে প্রায় একসাথেই বলে উঠল —'বাঃ! বেশ বলেছ তো।'

খুব সহজেই সমাধান হয়ে গেল। সেতুর পাশে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি। বিপুল বেগে জলপ্রপাতের ফলে ফেনিল জলকণা নৃত্যছন্দে ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের চোখে-মুখে। বড়-ছোট পাথরের পাষাণ-কারা ভেঙে প্রবল আলোড়ন তুলে পাষাণ জালের constriction-এর মাঝ দিয়ে দুরন্তবেগে নেমে আসছে। তার ফলে পাষাণ প্রাচীরে টানা-দাগের সৃষ্টি হয়েছে। ভক্তপ্রাণের বিশ্বাস এটাই শিবের জটাজাল। (আবার সেই বিশ্বাসের কথা!)। এখানেই নাকি মা-গঙ্গাকে মহাদেব জটায় ধারণ করেছিলেন এবং এই জটা বেয়েই সুরধুনী গঙ্গা করুণাধারা নিয়ে চলেছেন মর্ত্যধামে।

আর একটা দর্শনীয় জিনিস দেখা হলো না। প্রবল প্রপাতের পর ভাগীরথীর ধারা বয়ে চলেছে দুপাশে উঁচু ও বিশাল পাথরের জটাজালের মধ্য দিয়ে। ঠিক সেখানেই নাকি আছে ডুবন্ত এক শিবলিঙ্গ। নদীর বুকে একটা শিলা নাকি এমন সুন্দরভাবে অবস্থান করছে যা ঠিক শিবলিঙ্গের মতো দেখতে। এখন পলি-মিশ্রিত জলধারার মাঝে দেখা গেল না। শীতের শুরুতে জল যখন পরিষ্কার থাকে তখন দৃশ্যমান হয়।

ভাগীরথীর ওপারের অর্থাৎ যে-পারে এখন আমরা এসেছি, অর্থাৎ বাঁদিকের পায়ে-চলা পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। একটু এগিয়ে যেতেই কেদারগঙ্গা এসে মিশেছে ভাগীরথীর সাথে। সঙ্গমের প্রায় মুখেই পি. ডবলু. ডি. বাংলো। যাতায়াতের জন্য

কেদারগঙ্গার উপরে সেতু। পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে দুরন্তবেগে নেমে আসছে কেদারগঙ্গা। কেদারনাথ মন্দিরের উত্তরে কেদারনাথ পর্বত। সেখান থেকে নিসৃত হয়ে কেদারগঙ্গা নেমে এসেছে ভাগীরথী-সঙ্গমের জন্য। এদিকেই, একটু উপরের অংশে এবং আর একটু এগিয়ে পাহাড়ের কোলে সাধু-সন্তদের আশ্রম- আস্তানা- আখড়া-তপোভূমি।

আর একটু এগিয়ে যেতেই মন্দিরের কাছের সেতুটি। তারই মুখে আমাদের এখানকার আস্তানা গঙ্গা-নিকেতন। ডেরা ছুঁয়ে সেতুর উপরে এসে দাঁড়ালাম। আগে ছিল কাঠের সেতু, এখন হয়েছে লোহার ট্রাসের ব্রিজ। হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। কলকাতায় এতক্ষণ নগর-সৌধপরে দিবসের শেষ আলোক মিলিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা আছি গঙ্গোত্রী উপত্যকায়—অনেক পশ্চিমে। এখানে তাই অত তাড়াহুড়ো করে সন্ধে নামার কথা নয়। অস্তগামী সূর্যের রক্তাভা উল্টোদিকের পাহাড়ের গায়ে, এবং কিছুটা জলে প্রতিফলিত। তার ভাগ নিলাম আমরা—আমাদের চোখে-মুখে।

আবার ফিরে এলাম মন্দিরে—গঙ্গারতি দেখার জন্য। হরিদ্বারে মতো এখানেও, এই সময়ে, আরতি শুরু হয় সন্ধ্যে সাতটা চল্লিশে। তখনও হাতে কিছু সময় ছিল। মন্দির-প্রাঙ্গণে বহুলোকের সমাবেশ। আমরাও সুবিধামতো জায়গা নিয়ে একেবারে মন্দিরের মুখোমুখি বসলাম, যাতে ভালভাবে আরতি দেখা যায়। পূর্বমুখী মন্দির। মন্দিরের দিকে মুখ করে, অর্থাৎ পশ্চিমমুখে আমরা বসে আছি। মন্দিরের পিছনদিকে দূরে পর্বত-শিখরের পাশ দিয়ে আলো এসে পড়েছে।

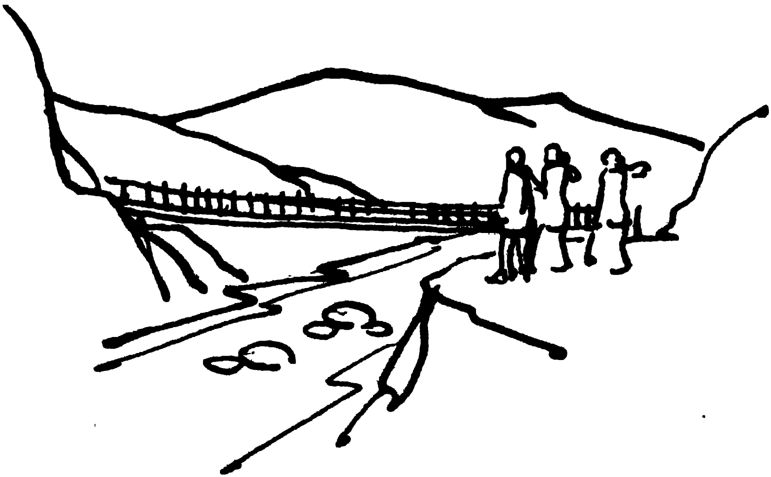
আরতি যখন শুরু হলো তখনও আলো আছে। খুব আশা নিয়ে গঙ্গারতি দেখতে বসেছিলাম, বিশেষত আজ যখন গঙ্গা-দশহরা, —যে পুণ্যতিথিতে গঙ্গা ধরাধামে অবতরণ করেছিলেন। কিন্তু আশাহত হলাম। অতি সাধারণ একক-আরতি, —যেরকম আরতি দেশের আনাচে-কানাচে সাধারণ মন্দিরেও দেখা যায়। প্রথমে মন্দিরের বিগ্রহের উদ্দেশে এবং পরে সামনের সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে গোমুখের উদ্দেশে। সত্যিই আশাহত হলাম। এবং এজন্যই উত্তরকাশীতে গঙ্গারতি দেখিনি। অথচ শম্ভু মহারাজের লেখায় পড়েছিলাম—"প্রদীপ বা ধুনুচি দিয়ে নয়, এখানে আরতি হয় মশাল জ্বালিয়ে। গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে ঢোল, কাঁসর ও ঘণ্টার তালে তালে প্রধান পুরোহিত আরতি করেন। আরতি শেষে মশাল হাতে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করেন। পথে শিব ও গণেশের মন্দিরে মশাল ছুঁইয়ে আসেন। শুরু হয় স্তোত্রপাঠ—তারপরে ভজন।..." আমরা আশাহত হব না কেন?

আরতি শেষ হতে আটটা। কলকাতায় রাত আটটা, এখানে সন্ধে আটটা।

দিনের আলো সবে মিলিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। আরতির পরে ভজন হয়। আমরা আর থাকিনি, গঙ্গা-নিকেতনে ফিরে এসেছি। আমি ভাল আছি, কিন্তু আমার ডানহাঁটু বোধ হয় একটু বেহাল হয়ে পড়েছে, তাই আমি বিশ্রাম নিতে চাইছিলাম। কিন্তু শিউলি গার্গী গঙ্গার পাশে, রেলিঙ-ঘেঁষে বাগান-ছাতার নিচে বসল। এসময় নাকি গরম চা-পানের শাস্ত্রীয় বিধান আছে।

দিনের বেলায় যথেষ্ট গরম ছিল। সন্ধেবেলায় ঠাণ্ডার অল্প আমেজে ভাল লাগছিল। রাতের খাওয়া যখন সারা হলো, তখন বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। রাতে লেপের আলিঙ্গনে আরাম বোধ করছিলাম, কিন্তু মাঝরাতে তো একবার উঠতেই হয়। উঠতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু উঠতেই হলো। এবং তখনই মনে হলো ওঠার চাপ এসে ভালই হয়েছে। দিনের বেলায় যত না মনে হয়েছিলো, রাতের বেলায় পারিপার্শ্বিক নিস্তব্ধতার জন্য ভাগীরথী গর্জন আরো বেশি করে কানে বাজছে। রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আকাশে দশমীর চাঁদ, নিচে ভাগীরথীর তরঙ্গ-ভঙ্গ। ঝিকিমিকি জলের প্রতিফলন আমার শরীরে। শুধু নদীর বুকেই নয়, চারিদিকের পাহাড়ে জোছনার হাসি। সবকিছু মিলিয়ে অপরূপ দৃশ্য। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তারা সাথে হিমেল জলীয় হাওয়া। গরম জামা-কাপড় আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে নিলাম।

রাতে ভাল ঘুম হয়েছে। সকালে উঠে একেবারে ফ্রেশ। তাজা।





গঙ্গোত্রী ছাড়িয়ে

ঘুম ভাঙল খুব ভোরবেলায়। ওরা আগেই উঠে পড়েছে। একটু পরেই গোমুখের জন্য রওনা হবে। আজ অবশ্য গোমুখ যাব না, রাত্রিবাস করব ভোজবাসায়। আগেকার দিনে যাত্রীদের রাত্রিবাসের একমাত্র জায়গা ছিল লালবাবার আশ্রম। এখন গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম (GMVN) ভোজবাসায় যাত্রী-বিশ্রাম-নিবাস তৈরি করেছে। যে সব আবশ্যিক জিনিসপত্র নিতে হবে, সেসব গতরাতেই মোটামুটি গুছিয়ে রাখা হয়েছিল। অন্যান্য জিনিসপত্র হোটেলের মালঘরে জমা রেখে গেলাম।

মন্দিরে মা-গঙ্গাকে প্রণাম করে যখন রওনা হলাম, তখন সাড়ে ছটা। মন্দিরের পাশেই গঙ্গার তীরভূমিতে হেলিপ্যাড। সারাপথেই মিলিটারির উপস্থিতি চোখে পড়েছে। গঙ্গোত্রীতেও মিলিটারি ছাউনি। গোমুখ পর্যন্তও পেয়েছিলাম। তিব্বত-সীমান্ত কাছেই। বস্তুত এই সড়কের বহুস্থান থেকে তিব্বতের সঙ্গে পায়ে-চলা পথে যোগাযোগ ছিল। দুদিকের পাহাড়ি মানুষের সহজ যোগাযোগ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে, কেনাকাটায় কোনো বাধা ছিল না। আজ সব রুদ্ধ। দুটি ভিন্ন দেশ, —তাই মিলিটারির সজাগ প্রহরা। হেলিপ্যাডের সুযোগ নেন ডিগনিটোরিরা। হেলিকপ্টারে সরাসরি এখানে নামেন এবং পুজো দেন সুরক্ষা-গণ্ডীর মধ্যে। তারপর হুশ্ করে ফিরে যান। পাহাড়ের সাথে, প্রকৃতির সাথে, নদী অরণ্যের সাথে একাত্ম হতে পারেন না। ঠিক যেন সাজানো বৈঠকখানায় স্যুটেড-বুটেড গায়কের মুখে ভাটিয়ালি গান শোনা।

মন্দির থেকে পূর্বদিকের হাঁটা-পথ ধরে, মিলিটারি হেলিপ্যাডের পাশ দিয়ে মূল সড়কে উঠে এলাম। না, গোমুখ যাত্রীর ভিড় নেই। মাঝবয়সী এক বাঙালি দম্পতি ও পাঁচজন মারাঠির একটি দল আমাদের আগে-পিছে রওনা হলেন। গৌরীকুণ্ড থেকে যখন কেদারনাথের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলাম তখন মুহূর্মুহু 'জয় কেদার' ধ্বনিতে চারিদিক রণিত হচ্ছিলো এবং একের পর এক কিংবা একযোগে বহু যাত্রী ও যাত্রীদল রওনা হচ্ছিলেন। এখানে না পেলাম সেরকম যাত্রীদলের দেখা, না ডাণ্ডি বা কাণ্ডি-বাহকদের। ঘোড়ায়ালাদেরও দেখা নেই। শুনলাম ওরা একটু নিচের দিকে আছেন। কিন্তু এটা তো অনেক বেশি স্বাভাবিক যে যাত্রা শুরু আগে যাত্রীদল মা-গঙ্গাকে প্রণাম করে রওনা হবেন, এবং সেক্ষেত্রে মন্দিরের পূর্বদিকের পায়ে চলা পথ ধরে সিঁড়ি ভেঙে মূল সড়কে এসে পৌঁছবেন। এবং তাহলে তো এখানেই ঘোড়ায়ালাদের দেখা পাওয়া স্বাভাবিক। কেদাবনাথে যাওয়ার সময় গৌরীকুণ্ডে যাত্রারম্ভের স্থান ঘোড়ার নাদে এবং জলে-নোংরায় আবিল ছিল। কিন্তু এখানকার পথ একেবারে সাফ-সুতরো। ইচ্ছে করলে পথের উপরে বসেই বিশ্রাম নেওয়া যায়। আসল কথা গোমুখ যাত্রীর সংখ্যা নগণ্য। পরে যাত্রাপথে এবং ফিরতি পথে সেটা ভালভাবে বোঝা গিয়েছিল।

প্রথমে স্থির ছিল আমরা পায়ে হেঁটেই ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে রওনা হব। পরে স্থির হলো একটা ঘোড়া নেওয়া হবে, এবং আমরা পর্যায়ক্রমে ঘোড়ায় চাপব। 'গঙ্গা মাইকী জয়' ধ্বনি দিয়ে প্রথম দফায় শিউলিকে ঘোড়ায় চাপিয়ে একই সাথে আমি আর গার্গী পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। দুপাশে তখন পাইন গাছের গার্ড অব অনার।

ক্রমে ক্রমে গঙ্গোত্রী জনপদ মিলিয়ে যেতে লাগল। ডানদিকে ভাগীরথী আমাদের সঙ্গী। ওপারে কয়েকটা বিক্ষিপ্ত ছাউনি চোখে পড়ল। পরে শুনেছি, ওখানে অনেক সাধুসন্ত ভগবৎ-সাধনা করেন। তপোভূমি। কয়েকবছর আগেও গঙ্গোত্রীতে নদীর বাঁ-তীর, অর্থাৎ মন্দিরের উল্টোপারে তাঁদের সাধনার শান্ত-সুন্দর স্থান ছিল। যত দিন যাচ্ছে, ততই সমতলভূমির নাগরিক সভ্যতার ছায়া বেশি করে পড়ছে। অনেক ধর্ম-ব্যবসায়ী আখড়া খুলে বসেছেন। তাই বিঘ্ন-বিরহিত সাধনার জন্য অনেকে দূরে সরে এসেছেন—আসছেন।

আমরা এগিয়ে চলেছি। থামতে হলো। পথের মাঝখানে এক দঙ্গল রামচন্দ্রের অনুচর। এমনভাবে পথ জুড়ে বসে আছে যে, মনে হচ্ছে এটা ওদের অবস্থান-জমায়েৎ। সন্দেহ করা যেতে পারে যে এদের মধ্যে অনেকেই এসপ্লানেড ইস্টের খবরাখবর রাখে। এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কি? খেয়াল করে দেখলাম, একটা গোদা-বাঁদর—হয়তো বা এদের লিডার— ভারিক্কী মেজাজে বসে আছে

এবং তার সঙ্গিনী উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে। একটু হুঁস্-হাস করতেই সরে গেল। অল রোড ক্লিয়ার। এত সহজেই পথ অবরোধ তুলে নিল! না, এসপ্লানেড ইস্টের ট্রেনিং নেই এদের।

আরও কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর গার্গী থেমে গেল। ডানহাতে একটা আশ্রম। প্রথমে খেয়াল করিনি, পরে বুঝতে পারলাম, এটা গঙ্গাদাস ফলাহারী বাবার আশ্রম। শুনেছি তিনি অন্ধ এবং গত পঞ্চাশ বছরের উপর এখানেই আছেন। শীতকালে প্রবল তুষারপাতের সময় তো দূরের কথা, অন্য সময়েও তিনি নিচে তো নয়ই, গঙ্গোত্রীতেও নামেন না। বছরের অন্য সময়েও না। এখানেই তাঁর সাধন-ভজন। তাঁর শিষ্য ও যাত্রীদের স্বতস্ফূর্ত সাহায্য এবং সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে তাঁর আশ্রম। তাঁরা ফলমূল শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন, সেসব দিয়েই বাবাজীর কালাতিপাত হয়। শীতের সময় দোকানপাট বন্ধ করে নিচে নেমে যাওয়ার সময় অনেক দোকানি শীতের লম্বা সময়ের জন্য অনেক জিনিস আশ্রমে প্রণামী হিসাবে দিয়ে যান। তাঁর আসল নাম কি জানি না। আজীবন তিনি পতিতপাবনী পাপহারিণী গঙ্গার সাধন-ভজন-পুজো করেছেন, নিজেকে মা-গঙ্গায় বিনীত দাস হিসাবে পরিচয় দেন, তাই তিনি গঙ্গাদাস বাবাজী নামে পরিচিত।

পুরোনো ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু গোরাচাঁদের সাথে হরিদ্বারে দেখা হয়েছিল। বলেছিল, আমরা গোমুখ যদি যাই, তাহলে পথে যেন গঙ্গাদাস বাবাজীর সাথে নিশ্চয়ই দেখা করে যাই। শিউলি হয়তো খেয়ালই করেনি এবং ঘোড়ায়ালা দিলদারও থামবার প্রয়োজন বোধ করেনি। গার্গীই খেয়াল করল। আশ্রমে গেলাম। কয়েকজন শিষ্য গঙ্গার দিকে মুখ করে বসেছিলেন। বাবাজীর কথা জিজ্ঞাসা করতে পাশের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করলেন। ছোট একটা ঘর; আলো কম। আত্মমগ্ন হয়ে বাবাজী বসে আছেন। তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে বললেন—'বেটা! গঙ্গামাই তেরা ভ্যলা করে।'

এখন আবহাওয়া মনোরম। আফশোষ এই যে পথে বা আশে-পাশে বরফ দেখছি না। পথ যদি বরফাবৃত না থাকে, যদি বরফ ভেঙে যেতে না হয়, তাহলে চলার রোমাঞ্চ কোথায়? আগেকার দিনে পথরেখা সুনির্দিষ্ট ছিল না, গাইড না নিয়ে গোমুখ যাওয়া আমাদের মতো সাধারণ যাত্রীদের পক্ষে চিন্তার বাইরেই ছিল। আজ কিন্তু সহজভাবেই চলতে পারছি।

ডানদিকে গঙ্গা বেশ নিচে। বাঁ-হাতে প্রায় খাড়াই পাহাড়। তেমন গাছপালা নেই, কিন্তু ওপারের পাহাড়ের বুকে ঘন বনানী। আমরা চলেছি ধীরে ধীরে, থামতে-থামতে। অথচ আমাদের পাশ কাটিয়ে এক গেরুয়াধারী এগিয়ে গেলেন হনহন করে।

এখন উল্টোদিকে ঢেউ-খেলানো পর্বত-শীর্ষে বরফের আচ্ছাদন চোখ পড়ছে। সামনেই একটা ছোট ঝোরা তিরতির করে নেমে এসেছে। হাতের ব্যাগ নামিয়ে রেখে গার্গী চোখে-মুখে জল দিয়ে নিল। আমাকেও রেহাই দিল না। কি কনকনে ঠাণ্ডা জল! গঙ্গা কাছেই এবং ততটা নিচে নয়। গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে গার্গী একটা বড় পাথরের উপর উঠে বসল। আমি তাড়া দিলাম—'তোর বৌদি এগিয়ে গেছে, আর আমাদের দেরী করলে চলবে?'

গলা খুলেই গান গাইছিল। গান থামিয়ে বলল—'এখানে হয়তো জীবনে আর আসা হবে না; ঘড়ির কাঁটার ভ্রূকুটি মানব কেন?'

'কিন্তু তোর বৌদি যে সামনের ছাউনিতে চায়ের জন্য অপেক্ষা করেই থাকবে!'

—'থাকুক না। জড়িয়ে ধরে বলব—হে বৌদিভাই! দেরী যদি আজ হয়ে থাকে, তবে করিয়ো ক্ষমা।'

হালকা—হলদে বেগুনি রঙের দুটো পাখি—ছোট্ট মিষ্টি পাখি চক্কর দিচ্ছিল। গার্গীকে প্রায় ছুঁয়ে সামনে ছোট একটা গাছের ডালিতে বসল পরম নিশ্চিন্তে। পেছনে নদী-পাহাড়ের পটভূমি।

'হাউ নাইস' !! বিদেশী মহিলা কণ্ঠের উচ্ছ্বাস! পেছনদিকে তাকিয়ে দেখি এক জোড়া বিদেশী-বিদেশিনী। কাঁধে হ্যাভার স্যাক, হাতে বায়নাকুলার ও ক্যামেরা।

'আ নাইস ফ্রেম ইনডিড'—পাখিদুটোর দিকে ক্যামেরা তাক করে বিদেশিনী পোজিসন দিলেন। উঁচু পাথরের উপর থেকে গার্গী নামতে যেতেই বারণ করলেন বিদেশিনী—'উড য়ু প্লিজ মাইন্ড টু বী সিটেড দেয়ার? ইয়োর গ্রেসাস প্রেজেন্স—' এবার আমার দিকে তাকালেন। বোধহয় আমার সম্মতি চাইছিলেন। আমি আর কি বলব, শুধু একটু হাসলাম।

ক্লিক! গার্গী পাথরের উপর থেকে নেমে এল। 'তুমি আমার ছবি তুলতে দিলে কেন?'

'তুললোই বা। দেশে ফিরে গিয়ে বন্ধুদের দেখাবে সুইট বার্ডস্ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান লেডি উইথ হিমালয়ান ব্যাকগ্রাউন্ড। ফতেপুর সিক্রিতে এক আমেরিকান ট্যুরিস্ট তোর বৌদিরও এরকম একটা ছবি তুলেছিল।'

খাপের মধ্যে ক্যামেরা ভরতে-ভরতে সুন্দর হাসির সাথে একটু 'বাও' করে বললেন—সুক্রিয়া। এদেশে এসে বিদেশীরা এই কথাটাই প্রথমে শিখে রাখেন। আমরাও হাসির সাথে প্রত্যুত্তর দিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালাম, ওরা কিন্তু নামতে লাগল নিচে ভাগীরথীর দিকে। ওদের তাড়াহুড়ো নেই। থামতে থামতে, দেখতে দেখতে ওরা পথ চলবে। আমরা যাচ্ছি নির্দিষ্টভাবে গঙ্গোত্রী-গোমুখে। ওরা ঘুরছে হিমালয়ে।

এখনও পর্যন্ত যতটুকু চলেছি, সেই পথ ভয়ের নয়, বিপদের সম্ভাবনাও দেখছি না—অন্ততঃ এ পর্যন্ত। আরো কিছুক্ষণ চলার পর পথের পাশে এক ছাউনিতে শিউলিকে দেখতে পেলাম। কোনো চটি নয়—অস্তি অস্থায়ী, শুধু একটু থেমে চা-লাড্ডু খাওয়ার ঠেক। এখানে তথাকথিত চা-নামীয় গরম তরল পদার্থ খেলাম।

এবারে গার্গীর ঘোড়ায় চাপবার পালা। কসরৎ করে ঘোড়ায় চেপে গার্গী এগিয়ে গেল। আমি আর শিউলিও পা বাড়ালাম।

আমি আর শিউলি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। পথ এখন ভারি সুন্দর। সেই ধরাসু থেকেই বলতে গেলে ভাগীরথী আমাদের পথ-চলার সাথী। এতখানি পথ একসাথে আসতে-আসতে জান-পহেচান হয়ে গেছে। বেশ ঘরোয়া-ঘরোয়া লাগছে এখন। মাঝে মাঝে কয়েকটা ছোট ছোট ঝোরা আমাদের সাথে খেলা করতে চাইছে।

এখন যে অংশে চলেছি সেখানে গাছপালা কম। বাঁ দিকে খাড়াই পাহাড়, ডানদিকে বিরাট খাদ। কেদারনাথের পথে লোক-চলাচল অনেক বেশি। একদল যাত্রী উপরে উঠছে, অপর একদল দেবদর্শন সেরে নিচে নামছে। কিন্তু গোমুখের পথে যাত্রী খুবই কম। হঠাৎ পেছন থেকে ঘোড়ায়ালার সাবধানবানি —'সম্‌হালকে, হিল-সাইডসে যাইয়ে।' পাশ দিয়ে ঘোড়সওয়ার চলে গেল। কিশোরী। জিনস-জ্যাকেট পরিহিতা পঞ্চদশী।

এতক্ষণ বেশ চলছিলাম। এবারই পথ অপরিসর এবং খারাপ। ছোট ঝোরার উপর কাঠের সাঁকো ভেঙে গেছে। কয়েকটা জায়গায় পাশাপাশি দুটো গুঁড়ি ফেলে রাখা হয়েছে। কোথায় শিউলিকে আমি সামাল দিয়ে নিয়ে যাব, কিন্তু এসব জায়গায় শিউলিই আমার প্রতি নজর রাখতে চাইছে আমার হাঁটুর কথা মনে করে। কিন্তু এর চাইতে বিপজ্জনক অবস্থায় পড়লাম আর একটু এগিয়ে। শিউলি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। —'এই জন্যই আমি আসতে চাইনি। এই পথে প্রাণ হাতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ?

সামনে রাস্তার চিহ্নমাত্র নেই। ধ্বস নেমে নিশ্চিহ্ন। কিন্তু যাত্রীদের যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো! পাহাড়ের গা-বরাবর কোনোরকমে ভারা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তার উপর দিয়ে কোনোরকমে একপা-একপা করে এগিয়ে চলেছি।

তা আর বলতে পারছি কই! বুঝতে পারছি প্রাণপণে নিচের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শিউলি কোনোরকমে এগিয়ে আসছে। বিপদসঙ্কুল অংশটুকু পার হয়ে পথের রেখায় এসে পৌঁছেই জড়িয়ে ধরল। ধক্ ধক্ করে কাঁপছে। ওখানে দাঁড়িয়েই একটু বিশ্রাম নিলাম। সামনেই অবশ্য লেখা রয়েছে—'কষ্টকে নিয়ে খেদ হ্যয়।'

একটু সামলে উঠতেই বললাম— 'একটু আগেই তুমি বলছিলে না, এইপথে কি প্রাণ হাতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব? উত্তরটা তো পেয়েই গেলে—এই পথে প্রাণ হাতে করে যাওয়ার মধ্যেই রোমঞ্চঘন-আনন্দ আছে। সহজ পথে সহজ ভাবে যাওয়ার মধ্যে আনন্দ কোথায়?

—'তোমার আনন্দ নিয়ে তুমিই থাক। আমি ভালয় ভালয় বাড়ি ফিরতে পারলেই বাঁচি।'

এগিয়ে যেতে যেতে বললাম—'তোমার কথা শুনে আমার ডক্টর মুখার্জীর কথা মনে পড়ছে।'

—'কোন ডক্টর মুখার্জী?'

—'আমাদের প্রফেসর, —সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট। পাশ করার পরই তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। স্বল্পভাষী পণ্ডিত মানুষ। বলেছিলেন—'তোমরা এবার নতুন জীবনে প্রবেশ করবে। এই কয়েকবছরে হয়তো তোমাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ হয়েছে, অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, হয়তো অনেকের সাথে মনোমালিন্যও হয়েছে। কিন্তু অনেকদিন পরে যখন ফেলে আসা এই দিনগুলোর কথা মনে পড়বে, তখন দেখবে কোথায় মিলিয়ে গেছে সেই সব ঘটনা। মধুর মুহূর্তগুলোই স্মৃতির মণিকোঠায় ভেসে উঠবে। তখন মনে হবে—'

কথার মধ্যেই হঠাৎ শিউলির exclamation 'দেখ, দেখ! কি সুন্দর—কি অপূর্ব!'

চোখ তুলে দেখলাম। ওপারে সামনের পর্বত থেকে লম্বালম্বিভাবে একটা ঝর্ণা নেমে এসে ভাগীরথীতে পড়েছে। উপরের দিকটা মেঘে ঢাকা। এর পেছনে অনেক পাহাড়-শ্রেণী। তারও পেছনে তুষারমণ্ডিত সম্মিলিত পর্বতশৃঙ্গের উপর সূর্যের আলো পড়েছে। দীপ্ত রূপালি হাসি। নকশা অনুযায়ী মনে হচ্ছে ভৃগুপন্থ শৃঙ্গ। শিউলি বলল—'কি অপূর্ব দৃশ্য-তাই না?'

ঠিক তাই। এপথে অবশ্য যেদিকই তাকাই, চোখ ভরে ওঠে। বললাম, —'দেখলে তো, সেই কথাটাই ঠিক"

—'কোন কথা?'

—'ডক্টর মুখার্জীর কথা। একটু আগের পথের বিপদের কথা নয়,

একটু চায়ের ছর্ভানতে গার্গী অপেক্ষা করছে। ওর ইনিংস শেষ। এবার আমি ঘোড়ায় চাপব। কাজু ও গ্লুকোজ জলে চাঙ্গা হয়ে আমি ঘোড়ায় চাপলাম। দিলদার—অর্থাৎ ঘোড়ায়ালা বলল—'আরামসে বৈঠিয়ে শেঠজি। হামারা ঘোড়া মস্ত হ্যায়।'

ছোটবেলা থেকেই তো পড়ে এসেছি, হর্স-ইজ অ্যা অ্যানোবল অ্যানিম্যাল। তোমার ঘোড়া তো মস্ত হবেই বাবা। দিলদার তো বলে খালাস। কিন্তু সহজ হয়ে বসি কি করে? একটা রেকাবে জুতোশুদ্ধ পা ঢোকানো গেছে, কিন্তু অন্য রেকাবটা ছোট, না আমার ডানপায়ের জুতো বড়? কোনোরকমে ঠেকিয়ে আছি। ফলে হিসেব করে ভারসাম্য বজায় রাখতে হচ্ছে। তাছাড়া উৎরাইয়ের সময় পিছনদিকে এবং চড়াইয়ের সময় সামনের দিকে ঝুঁকে সামাল দেওয়ার ব্যাপারটাও আছে।

মোটামুটি বেশ চলেছি। নড়বড়ে ব্যালান্স যাতে গড়বড় না করে দেয় সেজন্য সচেতন আছি, কিন্তু ঘোড়াদের আবার মহৎ দোষ ওরা খাদের ধার ধরে চলতে চায়। অবশ্যই জানি, ঘোটককুল শুধুমাত্র নোবলই নয়, ব্রেভ অ্যানিমালও বটে, কিন্তু আমরা তো ঘোড়াচড়ায়-অনভ্যস্থ মধ্যবিত্ত বঙ্গসন্তান। আমরা ভয় তো পেতেই পারি।

কোথাও বাঁদিকে পাহাড় থেকে পাথরের চাঁই ঝুলে আছে। দিলদারের হুঁশিয়ারি—'সমহালকে। শর ব্যচাকে শেঠজি!' ঝুঁকে মাথা বাঁচাতে গিয়ে একটু নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। দিলদার অবশ্য সামলে নিচ্ছে। এরই ফাঁকে চারিদিকের নিসর্গ দৃশ্য উপভোগ করতে করতে চলেছি। কয়েকটা বিশ্রী বাঁক সমেত চড়াই পার হলাম। তার আগেই পথ-নির্দেশ—'পাহাড়ের দিক ঘেঁষে সাবধানে চলুন।'

অনভ্যস্থ হলেও ঘোড়ায় চেপে যেতে বেশ লাগছিল। একটা অসুবিধাই শুধু মাঝে মাঝে খোঁচা দিচ্ছিল—তা হলো ডানপায়ের রেকাবের অসহযোগিতা। মাঝে-মাঝেই সরে গিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করছিল। পড়ে যাওয়া ব্যাপারটা নিশ্চয়ই পছন্দ হবে না। অতএব সুবিধামতো একটা জায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে গিয়ে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করে, ওরা এসে পৌঁছতেই শিউলিকে ঝাঁসির রানী হতে দিলাম।





চিরবাসা হয়ে ভোজবাসা

চিরবাসা।

একটা ঝোরা পার হয়ে চিরবাসায় এসে পৌঁছলাম। এদের ভাষায় গদেরা। কি যেন নাম ? ঠিক মনে করতে পারছি না। গরুড়-গঙ্গা কি ? পথের অন্যান্য ঝোরা থেকে অনেক বেশি জল। দুপাশে বড় পাথর এবং তার উপর গাছের গুঁড়ির সেতু। দেখেশুনে বুঝে ভেবে ব্যালান্স রেখে পার হতে হয়। একজন স্থানীয় লোক গার্গীকে হাত ধরে পার করিয়ে দিলেন। বললেন,—এখন তো তবু সহজে পার হলেন ; বেলা বাড়লে উপরের তুষার গলতে আরম্ভ করে—জল বেড়ে যায়। ঝোরা স্ফীত হয়ে ওঠে, উচ্ছল হয়ে ওঠে—বেগবতী হয়ে ওঠে। অনেক সময় এমনও হয় যে, পার হওয়া যায় না। আটক হয়ে পড়তে হয় যতক্ষণ না পড়ন্ত-বেলায় জল কমে যায়। ফেরার পথে আমরা আটক হয়ে পড়িনি ঠিকই, কিন্তু—। সেকথা অবশ্য পরে।

চিরবাসা। চির-বনের মধ্যে বাসা, অর্থাৎ চটি। চারদিকে চির অর্থাৎ পাইন গাছের বনানী। তারই মাঝে বিশ্রাম নেওয়ার, খাওয়ার এবং থাকার ব্যবস্থা। আজকাল অবশ্য এখানে রাত্রিবাস করার যাত্রী কম। গোমুখের পথে যাত্রীরা আজকাল সাধারণত রাত্রিবাস করেন ভোজবাসাতে। ভোজবাসায় লালবাবার আশ্রমে কিংবা গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের পর্যটক-বিশ্রাম-ভবনে। এখানে ব্যবস্থা অনেক ভাল। আগে অবশ্য ভোজবাসাতে থাকার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। সেটা বছর ৪০/৪৫ বছর

আগের কথা। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখছেন "....জায়গায় নাম চীরবাসা।....এই চীরবাসায় ফিরে এসে আবার রাত্রিবাস। কাল এখান থেকে ভোরে রওনা হয়ে দুপুরের মধ্যেই গঙ্গোত্রী পৌঁছনো যাবে। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যাওয়ার পথে এই একটিমাত্র আশ্রয়স্থল।..."

অনেকেই এখানে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সারছেন। ঘোড়ারা দানাপানি পাচ্ছে। দারুণ গরম। শ্রীঅঙ্গে একটা হাফ-হাতা সোয়েটার রেখে অন্য গরম কাপড়ের বোঝা হালকা করতে হয়েছে। জানি, পাহাড়ি পথে চলার সময় শরীর থেকে খুব গরম বার হয়, কিন্তু এরকম !

গঙ্গোত্রী থেকে রওনা হওয়ার আগে মোটামুটিভাবে স্থির করা ছিলো যে, গোমুখে আমরা পদব্রজেই যাব। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঠিক হলো যে একটা ঘোড়া নেওয়া হবে এবং আমরা পালা করে চাপব। এতক্ষণ তাই করে এসেছি। ঘোড়া না নেওয়ার (পরে অবশ্য বাধ্য হয়ে একটা নিয়েছি) কারণ এই যে, এই যাত্রা সম্বন্ধে এতদিন যা পড়েছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল এই পথ অতি দুর্গম এবং অতি অপরিসর। ফলে ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার ভয় ছাড়াও আশঙ্কা ছিল দুরূহ পথে ঘোড়ায় চাপবার ফলে সারা গতরে দারুণ ব্যথা হবে। প্রতি অঙ্গ কাঁদবে প্রতি অঙ্গ লাগি। কিন্তু এতটা পথ আসতে দেখলাম কিছুটা অংশ ছাড়া বাকি পথ একেবারেই ভয়াবহ নয়। —সেসব অংশে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে হেঁটে পার হতে হয়। এখন তাই ভাবছি তিনটে ঘোড়া নিলেই হতো।

চিরবাসাতে ঘোড়ার খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু পেলাম না। কেদারের পথে কিন্তু জংলাচটি কিংবা রামওয়াড়াতে ঘোড়া পাওয়া যায়। ঘোড়ায়ালারা জানে যে পায়ে হেঁটে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে রওনা হলেও অনেকের পক্ষেই সে সংকল্প ত্যাগ করতে হয়। এখানে ঘোড়া পাওয়া গেল না।

দুপুরের খাওয়া নয়, সঙ্গের টুক-টাক খাবার, গরম চা এবং তার সাথে বিরাট বিরাট পাইন গাছের শ্যামলাঞ্চলে একটু বিশ্রাম আমাদের ক্লান্তি হরণ করে নিল। শিউলি একটু আপত্তি করলেও ওকেই আবার ঘোড়ায় চাপিয়ে রওনা করিয়ে দিলাম।

চিরবনের ভেতর দিয়ে উঁচু-নিচু পথে এক-দেড় কিলোমিটার সহজেই পাড়ি দিলাম। পাশেই বিরাট খাদ, অনেক নিচে নদী। দাঁড়িয়ে দেখতে ভাল লাগার সাথে ভয়ও জড়িয়ে থাকে। বিপদের ভয় তো সহজে যাওয়ার নয়, আবার উপভোগ করার দৃশ্য থেকে সরে আসতেও মন চায় না। ভাগীরথী কোথাও সংকীর্ণ, আবার কোথাও তার বিস্তার অনেক জায়গা জুড়ে। কোথাও বা বিস্তৃত হয়ে দুভাগে বিভক্ত হয়ে আবার মিলিত হয়েছে। মাঝখানে নুড়ি-পাথরের ছড়ানো জায়গা।

দেড়-দুই কিলোমিটার চলার পর এসে পড়লাম এক বিপদজ্জনক অংশে। 'গিলা

পাহাড়' বা 'ঝুরা পাহাড়'। বাঁদিকে পাহাড়ের পাথর ও মাটির বাঁধুনি শিথিল। বড় বড় পাথর উপর থেকে প্রায়ই গড়িয়ে পড়ে। চিরবাসার আগে এরকম দু-তিনটে ছোট অংশ পার হয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে এর প্রসার প্রায় দেড়-দুই কিলোমিটার জুড়ে। মাঝে মাঝেই উপর থেকে পাথর গড়িয়ে নিচে নেমে আসে। অসাবধান হলেই বিপদ। সাবধান থাকলেই যে রেহাই পাওয়া যাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। দেখে-শুনে পার হওয়ার সময় হঠাৎ সামনে পেছনে কিংবা মাথার উপরেই পাথর পড়তে পারে। এবং এটার সম্ভাবনা বেশি হয় বেলা বাড়লে। আমরা সেটা জানতাম না। গাইড বা ঘোড়ায়ালা সতর্ক করে দিয়ে প্রায় আগলেই বিপদ্জনক অংশগুলো নিরাপদে পার করিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের সাথে না ছিল গাইড, না ঘোড়ায়ালা। আগে-পিছে যাত্রীও ছিল না। গার্গীর দুশ্চিন্তা ছিল আমার ডান হাঁটুর ব্যথার জন্য এবং আমার যাতে ব্যথা বেড়ে না যায় এবং কষ্ট কম হয়, তাই প্রায় জোর করেই কিছু অন্তর অন্তর আমার জন্যই বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা করছিল।

পথের পাশে এখন আর কোনো গাছপালা নেই। রুক্ষ প্রকৃতি। রোদের তেজ কষ্ট দিচ্ছে। তবুও জুৎসই বড় পাথরের চাঙর দেখে তার উপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। বোঝা কমানোর জন্য শিউলি ও ঘোড়ায়ালার হেফাজতে সবকিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওয়াটার-বটল ও ক্যামেরা ছাড়া সঙ্গে কিছু নেই। জলও শেষ হয়ে এসেছে। ক্লান্ত-অবসন্ন শরীরকে একটু বশে রাখার জন্য হিসাব করে শরীরকে কয়েক ফোঁটা জলের যোগান দিতে হচ্ছে।

এরকমই রুক্ষ প্রকৃতির এক অংশে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। এক গেরুয়াধারী আমাদের পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন। যা বললেন তার অর্থ এই: আমরা বোধহয় জানি না যে, 'গিলা পাহাড়ের' অংশে আমরা বসে আছি। যে কোনো সময় শিথিল পাথরের চাঁই উপর থেকে স্থানচ্যুত হয়ে নেমে আসতে পারে। আমরা যেন অবিলম্বে এই স্থান ত্যাগ করি। বস্তুত, তিনি প্রায় জোর করেই আমাদের উঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ আগে যে মাঝ-বয়সী বঙ্গ-দম্পতির সাথে আলাপ হয়েছিল, তাঁদের কি হবে? কে তাঁদের সাবধান করবে? গার্গী বলল—'আমরাও তো এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম না, ইনি আমাদের সচেতন করলেন। ওঁদের অবহিত করার জন্য ভগবান অন্য কাউকে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবেন।'

সেই প্রার্থনাই করছি। ওঁদের কাহিল অবস্থা দেখে খারাপ লেগেছিলো, বিশেষত ভদ্রমহিলার অবস্থা বেশ সঙ্গীনই ছিল। তার উপর তাঁরা হনুমান চটি থেকে যমুনোত্রী পায়ে-হেঁটে ওঠা নামা করে এখানে এসেছেন। সেই ধকল ও শ্রান্তি পুরোপুরি

কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তবু এর মধ্যে আশার কথা ছিল ভদ্রমহিলার মনের জোর। বলেছিলেন—'আপনারা এগিয়ে যান, ভোজবাসাতে দেখা হবে।'

বেশ কষ্ট করেই সেই বিপদসঙ্কুল পথ—সেই ক্লান্তিকর পথ অতিক্রম করে এলাম। কিভাবে এলাম জানি না। আমার ডান হাঁটুর ব্যথা তো ছিলই, গার্গীও ডানপায়ে কষ্ট পাচ্ছিল জুতোর বেয়াদপির জন্য।

আর পারছি না। আমাদের শারীরিক অবস্থা এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, মনে হচ্ছে এখানেই বসে পড়ি—এখানেই পড়ে থাকি। ভোজবাসা এখনও প্রায় দুই কিলোমিটার। খালি পেটে থাকতে আমার কষ্ট হয় ; খাবারের ব্যাগ শিউলির সাথে চলে গেছে। নিদারুণ শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং কাহিল হয়ে আমি আর গার্গী ছোট একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়েছিলাম।

'হাই! সেই বিদেশী-বিদেশিনী। কাঁধ থেকে হ্যাভারস্যাক নামিয়ে পাশেই বসে পড়ল। আমার মাথায় মাঙ্কি-ক্যাপ ভাঁজ অবস্থায় ছিল। গার্গীকে মাথায় স্কার্ফ জড়িয়ে নিতে বলল এবং মুখে রুমাল। তাহলে লু লাগবার ভয় থাকবে না। ভাবতে আশ্চর্য লাগলেও, এই বছরের অস্বাভাবিক এবং বেনিয়মী গরমে গোমুখের পথেও লু লাগবার ভয়!

খুচরো আলাপ হলো। ইতালিয়ান। রোম থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার দূরে বাড়ি। বম্বে-গোয়া-অজন্তা-ইলোরা দেখে দিল্লী হয়ে হিমালয়ে। আগ্রা-বেনারসেও যাবে। না, তারা ভোজবাসায় থাকবে না, সোজা গোমুখে যাবে এবং সেখানেই—। হ্যাঁ, তাঁরা জানে যে সেখানে রাত্রিবাসের সেরকম ব্যবস্থা নেই, কিন্তু শুনেছে চা-জলখাবারের অস্থায়ী দোকান আছে, সেখানেই পড়ে থাকবে। সেখান থেকে তপোবন, নন্দনবন এবং তারপরে—। আলপ্‌সে তারা গিয়েছে, কিন্তু হিমালয়ান গ্রাঞ্জরের কাছে কিছুই লাগে না। ওঠার আগে দুটো চুইংগাম দিয়ে গেল এবং ভাঙা হিন্দিতে বেশ বলল —'ঘংগা মাই ব্যলা করে।'

বিদেশী-বিদেশিনীর চেহারা মিলিয়ে গেল। আরো একটু বিশ্রাম নিতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু না, তাড়াতাড়ি ভোজবাসা পৌঁছনো দরকার।

যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া, তবুও মহা-আশঙ্কার কথা কল্পনাতেও আনব না। নতুন উদ্যমে পথ-চলা শুরু করলাম, এবং একসময় দূর থেকে লালবাবা আশ্রমের একাংশে একটা পতাকা চোখে পড়ল। এসে গিয়েছি তাহলে!

ক্লান্ত শরীর টেনে টেনে ঢালু পথ ধরে লালবাবা আশ্রমকে বাঁপাশে রেখে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের যাত্রী-নিবাস-ভবনে এসে পৌঁছলাম। ঘোড়ায় চেপে শিউলি আগেই পৌঁছে গিয়েছিল এবং ডরমিটারিতে তিনটে বেড বুক করে রেখেছিল। প্রসঙ্গত, এখানে কোনো আলাদা ঘর নেই। তিনটিই ডরমিটারি।

আমাদের শরীরে তখন আর কিছু নেই—সমস্ত শক্তিই নিঃশেষ। অবস্থান জেনে, ঘরে ঢুকেই বিছানার উপর গড়িয়ে পড়লাম না—দেহ ফেলে দিলাম। গার্গীর মুখে কোনো কথাই নেই। জুতোসুদ্ধ শুয়ে পড়ল। আমার মুখ দিয়ে এক টুকরো কথা মাত্র বার হয়েছিল। তিরিশ বছরের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম শিউলিকে পা থেকে জুতো খুলে নেওয়ার কথা বললাম। তারপর আর কিছু জানি না। ঘুম। ক্লান্তিহর ঘুম।

ভোজবাসাতে আমরা পৌঁছেছিলাম সওয়া দুটো নাগাদ। ক্লান্তি-ঘুমের ঘোর কাটল সাড়ে-তিনটের পরে। দুপুরের খাওয়া হয়নি। শিউলি খাওয়ার অর্ডার দিয়ে রেখেছিল। পাওয়া গেল আলু-পরোটা। আমার আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় শিউলি আলু-পরোটা টুকরো-টুকরো করে খাইয়ে দিল। একটু প্রাণ পেয়ে উঠে বসে চা খেলাম। গার্গী একটু আগেই উঠেছে।





ভোজবাসা

গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখের মধ্যে বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা দুটি—প্রায় ৮/৮½ কিলোমিটার দূরে চিরবাসা (উত্তরপ্রদেশের পর্যটন দফতরের একটা প্রচারপত্রে ১২ কিলোমিটারের উল্লেখও দেখেছি), এবং ১৪ কিলোমিটার দূরে এই ভোজবাসা। হিমালয়ের বিভিন্নস্থানের দূরত্ব বা পর্বতশিখরের উচ্চতা প্রসঙ্গে দুটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। বাইরে কিনতে পাওয়া গাইড বইয়ের কথা বাদ দিলাম, পর্যটন দফতরের প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তিকা বা প্রচারপত্রে বিভিন্ন রকম তথ্য দেওয়া আছে। উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। গঙ্গোত্রীর উচ্চতা প্রসঙ্গে বিভিন্নতার কথা আগেই বলেছি। এবার দূরত্বের কথায় আসছি।

গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখের দূরত্ব :

(১) ভারত সরকারের পর্যটন দফতরের পুস্তিকায়	২৩ কিলোমিটার
(২) উত্তরপ্রদেশের প্রচারপত্রের নকশায়	২২ ,,
(৩) উত্তরপ্রদেশের প্রচারপত্রের নকশায়	১৯ ,,
(৪) উত্তরপ্রদেশের পর্যটন দফতরের সাইক্লো করা প্রচারপত্রে	১৮ ,,

এরকম গরমিলের উল্লেখ আগেও পেয়েছি। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখের দূরত্ব যাই হোক না কেন, পথে রাত্রিবাস করতে হলে যাত্রীদল ভোজবাসাতে থাকাই সুবিধার মনে করেন। আজকাল খুব কমে গেলেও এককালে এই অঞ্চলে প্রচুর

ভূর্জবৃক্ষ ছিল। চিরবাসার মতো ভূর্জবৃক্ষের স্নেহচ্ছায়ায় বাসা বলেই ভূর্জবাসা। ক্রমে ভূজবাসা—ভোজবাসা।

এবার ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। ক্লান্তির আবরণ সরে গেলেও গায়ের উপর লেপ টেনে গড়াতে আরাম লাগছিল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল বাইরে গিয়ে প্রাকৃতিক শোভা দেখি, কিন্তু মনে হলো—হিমালয়ের এই পথ সর্বত্রই তো শোভাময়—সব সময়ই তো মনে হয় কি হেরিনু নয়ন মেলে, তাই এখন গড়িয়ে নিই, আগামীকাল ভোরবেলায় উঠে—।

গার্গীকে শিউলি মাথার দিকের জানালাটা খুলে দিতে বলল, এবং তখনই, শুধু বিছানায় উঠে বসা নয়—ক্যামেরা হাতে বাইরে ছুটে এলাম সামনের উন্মুক্ত প্রান্তরে।

বিকেলের নরম আলোয় মাঠ-প্রান্তর-আশ্রম-নদীস্নাত। একটু দূরে উপলমুখর ভাগীরথীর বুক থেকে কুলুধ্বনি ভেসে আসছে। কিন্তু এ সবকিছুই তুচ্ছ। উল্টোদিকে পাহাড়ের আড়ালে সূর্য দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তার আলো গিয়ে পড়ছে দূরে গোমুখ ছাড়িয়ে ভগীরথ পর্বত শিখরে—পাশের শিবলিঙ্গ পাহাড়ের চূড়ায়। বিদায়ী সূর্যালোকের অপরূপ খেলা। মনে হচ্ছে গলানো সোনা গড়িয়ে পড়ছে পর্বতশৃঙ্গ থেকে। লাল-কমলা-সোনালি সব রঙ মিলে মিশে রঙিন হাসি ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার আভা এসে পড়েছে আমাদের চোখে মুখে। সারা শরীরে। এবং মনের মণি কোঠাতেও।

যে কয়েকজন ছিলাম, প্রত্যেকের ক্যামেরা সক্রিয় হয়ে উঠল, কিন্তু নিষ্প্রাণ ক্যামেরা কতটুকু সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারবে? পর্বতশীর্ষে—চাঁদের হাসি নয়—রবির হাসির বাঁধ ভেঙেছে, সেই সুধামাখা হাসির কতটুকুই বা প্রতিফলন হবে ক্যামেরার বুকে?

গার্গী তো উন্মুক্ত প্রান্তরে আঁচল উড়িয়ে নেচে বেড়াতে লাগল। খুশি, উল্লাস এবং প্রাণময়তা নিশ্চয়ই ছোঁয়াচে। শিউলিও নেচে বেড়াচ্ছে। আমাকেও টেনে নিয়ে গেল। বাহির করেছে পাগল ওরে। বিদায়ী সূর্যালোক বা হিমেল হাওয়াকে নস্যাৎ করে দিয়ে জটায়ু হয়তো তোপসেকে বলতেন —বলতেন কেন, হয়তো দুহাত তুলে গলা ছেড়ে গেয়ে উঠতেন জোছনা-রাতে সবাই আছি বনে / বসন্তের এই মাতাল সমীরণে। বসন্তের মাতাল সমীরণ না হোক, এই পর্বতমালা, এই প্রকৃতি, এই পরিবেশ, সন্ধ্যার এই মায়ালোক সত্যিই মাতাল করে তোলে।

শিবলিঙ্গ শিখর দেখা যাচ্ছে একটু পাশ থেকে। এখন নিচের দিকটায় আলো নেই, শিখরের তুষার জ্বলজ্বল করছে, লালচে আভা গভীর আলিঙ্গনে শৃঙ্গদেশ জড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু বিদায় তো নিতেই হবে। মিলন আর বিরহ, বিরহ আর

মিলনের খেলাই তো বিশ্বপ্রকৃতিতে। ধীরে ধীরে আলো মিলিয়ে গেল। আকাশের বুকে হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গের সিল্যুট ছবি। সন্ধ্যা নামছে। হিমালয়ে সন্ধ্যা নামছে। ভাগীরথীর বুকে সন্ধ্যা নামছে। সন্ধ্যা নামছে ভোজবাসার প্রান্তরে।

আমরা জায়গা পেয়েছি ৩ নং ডরমিটারিতে। মোট ন'টি শয্যাতে ন'জনই বঙ্গসন্তান। কারো বাড়ি ভদ্রেশ্বরে, কেউ বা শ্রীরামপুরের এবং কয়েকজন থাকে চন্দননগরে। অতএব, তাঁদের নামকরণ করা হলো ভদ্রবাবু, রামবাবু এবং চন্দনবাবু। এঁদের দলেই ছিলেন একজন পঁয়ষট্টি বছর বয়সী ভারী চেহারার মাসিমা। মাসিমাদের দল আজই গোমুখ দেখে ফিরে এসেছেন। ভোজবাসা থেকে গোমুখে ভাগীরথীর উৎস চার কিলোমিটারের কিছু বেশি এবং শেষ এক কিলোমিটারের উপর কঠিন পথ। কঠিন বললে কম বলা হয়, —কোন নির্দিষ্ট মার্গ নেই। তিনি কিন্তু শেষ অবধি গিয়েছেন। বয়স হলেও পথের দুর্গমতা দেখেও পঁয়ষট্টিকে পাত্তা দেন নি। শিউলির মনে কিন্তু-কিন্তু ভয় ছিল ; মাসিমার কথায় উৎসাহ ফিরে পেল।

এখানকার সব কর্মীই স্থায়ী নয়। রাতের খাওয়ার পর ম্যানেজারের ঘরে বসে কথা বলছিলাম। এখানে এখন যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র দু'জন স্থায়ীকর্মী। অন্যান্যদের মেয়াদ পর্যটন-মরশুমের জন্য—অর্থাৎ মাস-ছয়েকের চুক্তি। যে ছেলেটি খাবার পরিবেশন করছিল, সে অস্থায়ী কাজের লোক।

—'তোমরা শীতের ছ'মাস কি কর ?'

—'ক্যা করনা হ্যয় শেঠজি ! প্যহলে তো কুছ ভী ন্যাঁহি করতা থা, সির্ফ গাঁওমেঁহী পড়া র‍্যহতা থা। আজকল নিচে উতর যাতা হুঁ—কৌই না কৌই ছোটাসা কাম মিল হি যাতা।'

চন্দনবাবুও সঙ্গে ছিলেন। ওঁরা আজ গোমুখ থেকে ফিরেছেন। গায়ে-হাত-পায়ে ব্যথার কথা বলতে ম্যানেজার দুটো ব্যথা-নিরোধক ট্যাবলেট দিলেন। সরকারী তরফ থেকেই কয়েকটি প্রয়োজনীয় ওষুধ রাখা হয় যাত্রীদের জন্যই। হঠাৎ দরকার পড়লে কোথা থেকে পাবে ?

রাতে শুতে যাওয়ার তোড়জোড় করার আগে ওয়াটার বটলে জল ভরে রাখা দরকার। এখানে পানীয় জল বলতে ঝর্ণার জল। ঝর্ণা থেকে পাইপ-বাহিত জল আনা হয়েছে বিশ্রাম-ভবনের পিছনের দিকে। আমি আর গার্গী জলকে চললাম। বাইরে জব্বর ঠাণ্ডা ! হিমালয় যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশে একাদশীর চাঁদ। এবং এখনই চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে-উছলে পড়ে আলো।

শ্রীরামপুরের ভদ্রমহিলার শরীর ম্যাজ-ম্যাজ করছে। তাই রামবাবু তাঁকে গা-ব্যথা সারানোর গরম ওষুধ খাইয়ে দিলেন। দুটো বাচ্চা—আট-দশ বছর বয়স—তাদেরও দুধ গুলে দুচামচ গরম ওষুধ খাইয়ে দেওয়া হলো। ওদেরও কাল হাঁটতে হবে।

যা' ভাবা যায়, তা সহজে হয় না। মাসিমার উৎসাহে শিউলির নড়বড়ে ভাব চলে গিয়েছিল, কিন্তু শোবার কিছু পরেই বমি হলো। সঙ্গে জ্বর ও গা-হাত-পা ব্যথা। এদিকে গার্গীর অসম্ভব মাথা ধরেছে এবং ঘাড়ে দারুণ যন্ত্রনা। ওদিকে, আমার বাঁ দিকের বিছানায় যিনি শুয়েছিলেন, সেই ভদ্রবাবু প্রায় সারারাত উঃ-আঃ করে গেলেন। তাহলে কি গোমুখ যাওয়া হবে না ? মা-গঙ্গাকে স্মরণ করে কলকাতা থেকে রওনা হয়েছি, দেখা যাক কি হয় ?

যা আন্তরিকভাবে চাওয়া হয়, তাই বোধহয় পাওয়া যায়। ভোর হতেই সব সমাধান। সকলেই যাওয়ার মতো যথেষ্ট সুস্থ এবং যেতে পারবে। অতএব, সকালে চা এবং কিঞ্চিৎ জলখাবার খেয়ে মা-গঙ্গার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে গোমুখ রওনা হওয়ার তোড়জোড় শুরু হলো।

বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এখানে বোধহয় কাক নেই। তবে খুব ছোট দুটো পাখি আমাদের আগেই ঘুম থেকে উঠে মর্নিং-ফ্লাইং সেরে এসে বাংলোর কার্নিশে বসে আমার দিকে তাকিয়ে শিষ দিয়ে উঠল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম পাখি দুটো প্রেমিক-প্রেমিকা এবং আমাকে সুপ্রভাত জানাল। ওদের শিষের সুপ্রভাতের উত্তরে আমি ছোট্ট হাসি দিয়ে পাল্টা সুপ্রভাত জানালাম।

—'গুড মর্নিং আংকেল !' না, ছোট পাখি নয়, তবে ছোট লাল পাখির মতোই রামবাবুর আট বছরের মেয়ে। লাল উলেন পোষাকের সাথে মাথায় লাল স্কার্ফ।

—'গুড মর্নিং মা-মনি। তুমিও গোমুখ যাবে নাকি ?'

—'যাবোই তো। দিদা বলে দিয়েছে ওখান থেকে খাঁটি গঙ্গাজল নিয়ে যেতে।'

যাঁরা গোমুখ যান, তাঁরা প্রায় সবাই ওখান থেকে গঙ্গাবারি নিয়ে আসেন। উৎসমুখের পবিত্র উদক। শিউলি আর গার্গীও গঙ্গোত্রী থেকে পলিথিনের ছোট পাত্র কিনে নিয়ে এসেছে। একে একে প্রায় সবাই বাইরে এসে জড়ো হয়েছেন। এখান থেকে যেমন, তেমনই লালবাবা আশ্রম থেকেও কয়েকজন রওনা হয়ে গেলেন।

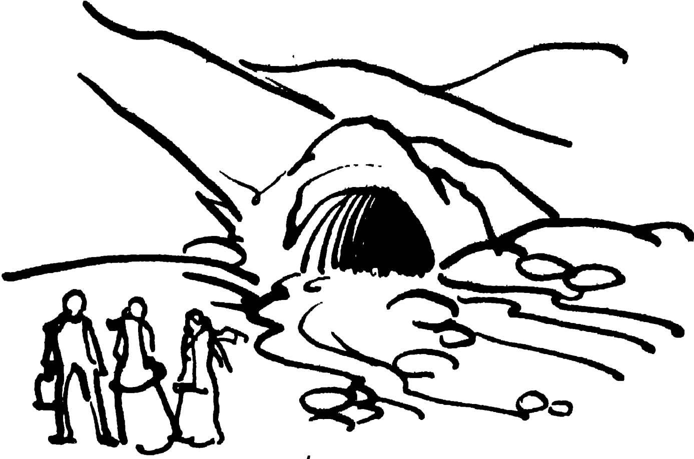
গতকাল সেরকম অবস্থায় ছিলাম না, কিন্তু আজ চারিদিকে তাকিয়ে দেখছি। কল্পনার সাথে বাস্তবের মিল কম। ভেবেছিলাম ভূর্জগাছের অঙ্গনে লালবাবার আশ্রম বা এই বিশ্রাম-ভবন। কিন্তু কোথায় সেই ভূর্জবন ?

ছিল, ভূর্জবন ছিল। এখন তা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পথে হলেও কিছু আছে উপরের দিকে এবং কয়েকটা লালবাবা আশ্রম-প্রাঙ্গণে। শুধু এখানে নয়, চিরবাসাতেও ছিল এই গাছের সমারোহ। বছর ৪০-৪৫ আগে উমাপ্রসাদ লিখেছেন (চিরবাসার আগেই) "একটু উঠেই জঙ্গল চারিদিকে শুধু ভূর্জপত্রের গাছ।..."

বছর তিরিশ আগে শঙ্কু মহারাজ লিখছেন "...ভূর্জগাছের একটি জঙ্গলের মধ্যে এসে পৌঁছেছি। ...ঐ তো পাহাড়ের পদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে চিরবাসা ধর্মশালা।"

তাঁরা অবশ্য গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ গিয়েছিলেন ভাগীরথীর অপরপার ধরে অর্থাৎ বাঁ তীর বরাবর। আমাদের এখানকার পথ এপার অর্থাৎ ডানতীর ধরে। তবুও আমরা চিরবাসায় ভূর্জপত্রের গাছ দেখেছি। চিরবাসাতে ঘোড়ায় চেপে শিউলি রওনা হয়ে যাওয়ার পর আমি আর গার্গী প্রথম যে গাছ-গাছালির ছায়ায় বিশ্রাম নিয়েছিলাম সেগুলি ছিল ভূর্জগাছ, ইংরেজীতে যার নাম বার্চ ট্রি। যে অংশকে গাছের কাণ্ড বলা হয়, সেই অংশটুকু প্রায় নেই বললেই চলে। মাটি ছাড়িয়ে ওঠার পরই ডালপালা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। চিরবাসাতে গাছগুলির প্রতি সেরকম নজর দিইনি, বা গার্গীকেও সেভাবে দেখিয়ে দিইনি, কেন না ভেবেছিলাম ভোজবাসায় তো এন্তার ভূর্জগাছ দেখতে পাব, ঘুরে বেড়াতে পারব জঙ্গলের মধ্যে, তখন ওদের ভাল করে দেখাব। গাছের বাকল টেনে খুলব, যা হবে মসৃণ কাগজের মতো। স্মারক হিসাবে সঙ্গে নিয়ে আসব। শুকিয়ে গেলে তার বুকে তারিখ দিয়ে আমাদের তিনজনের নাম লিখে রাখব। তা আর হলো কই! অথচ আগেকার দিনে এই গাছের বাকল দিয়ে পরিচ্ছদের কাজও চলত। মসৃণ, টেঁকসই বাকলে কত কবির কাব্যকথা যে স্থান পেয়েছে! সেকালের কত পণ্ডিত শাস্ত্ররচনা করে গেছেন ভূর্জপত্রের বুকে। কোথায় সেই 'প্রিয়সুখভাগিনী'—রবীন্দ্রনাথ যার উদ্দেশে লিখেছিলেন— "ভূর্জপাতায় নবগীত করো রচনা, ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।" কোথায় সেই কালিদাসের কাল, যখন ভূর্জপত্রে একটি শ্লোক রচনা করে দশম রত্ন হওয়ার বাসনা জাগত!





গঙ্গার উৎসমুখ : গোমুখ

'জয় গঙ্গা মাই কি'!

লালবাবার আশ্রম থেকে চারজনের একটি দল এগিয়ে যাচ্ছে। শিউলিও ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেল। আমি আর গার্গীও মা-গঙ্গার জয়ধ্বনি দিয়ে গোমুখের জন্য রওনা হলাম ভাগীরথী তথা গঙ্গার উৎসমুখের উদ্দেশে।

গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ মোটামুটি ১৮ কিলোমিটার এবং ভোজবাসা থেকে ৪ কিলোমিটার। এটা একটা মাপের হিসাব। কিন্তু এই পার্বত্য অ-পথে এই হিসাব পুরোপুরি ধারণা তৈরি করাতে পারে না। সমতলে ১৫-২০ কিলোমিটার পথ এই অ-পথের চাইতে অনেক সহজে এবং বিনা কষ্টে যাওয়া যায়।

সকালবেলায় পথ চলতে ভারি ভাল লাগছে। সূর্যদেবের মুখ দেখতে পারছি না, পাহাড়ের আড়ালে তিনি আছেন, কিন্তু তার প্রাণের প্রকাশে চারিদিক উদ্ভাসিত। উত্তুঙ্গ তুষারাবৃত শিখরে এক ঝাঁক রোদ্দুর ঝিকমিক করছে। ভোর এবং সাঁঝের বেলায় দেখা যায় আলোর খেলা—গত সন্ধ্যায় যেমন ভোজবাসা থেকে দেখেছিলাম।

ভাগীরথীর কলতান শুনতে শুনতে চলেছি। নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা গুহার মতো চোখে পড়ল। হয়তো সাধুদের এককালের আস্তানা। আজ আমরা নদীর এপার ধরে চলেছি, কিন্তু আগেকার দিনে গোমুখযাত্রীরা যেতেন ওপারের পথ ধরে। 'ওপারের পথ ধরে যেতেন'—কথাটা বলা হয়তো ঠিক হলো না, কারণ পথই ছিল না। আজ আমাদের সাথে গাইড নেই, প্রয়োজনও নেই।

কিন্তু সেকালে গাইড ছাড়া গোমুখ যাওয়া অকল্পনীয় ছিল। গাইডের দল সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে পরম নির্ভরতার সাথে যাত্রীদের উৎসমুখ দর্শন করিয়ে আনতেন। অনেকে আবার গোমুখ ছাড়িয়ে তপোবন এবং নন্দনবনেও যেতেন। ওদুটি জায়গায় যাত্রীসংখ্যা তখনকার মতো এখনও নগণ্য। আমরা যারা গতরাতে বিশ্রাম-ভবনে ছিলাম, তাদের মধ্যে কেউ তপোবন কিংবা নন্দনবনে যাব না। গঙ্গোত্রীতে একজন বিপত্নীক বাঙালি ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হয়েছিল—সঙ্গে দুই মেয়ে, একটির বয়স বছর ১৩-১৪ এবং অপরটির ১৬-১৭ বছর। ওরা তপোবন যাবেন। এক সহযাত্রী বলেছিলেন—'শুনেছি গোমুখের পথই যথেষ্ট দুর্গম, তপোবনের পথ তো তাহলে—। পারবেন যেতে?'

ভদ্রলোক বলেছিলেন—'সবই মায়ের ইচ্ছে।'

বড়মেয়ে বলল—'না পারার কি আছে কাকু? দুর্গমপথে তো 'মানুষ' পাড়ি দেয় না—পাড়ি দেয় মানুষের সংকল্প, মানুষের মনের জোর, মানুষের অভিযাত্রিক স্পৃহা।'

শিউলিকে গার্গী বলেছিল—'শুনলে তো বৌদি? তুমি গোমুখ যাওয়ার কথাতেই দোনামনা করছিলে—।'

প্রায় দুই কিলোমিটার যাওয়ার পরে দেখলাম যাত্রামার্গের চিহ্ন ততটা স্পষ্ট নয়। এতক্ষণ পথের রূপরেখা ছিল, কিন্তু এর পরের অংশ পায়ে-পায়ে চলতে-চলতে যেমন হয় সেরকম দাঁড়িয়েছে। উমাপ্রসাদ লিখেছেন: "গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যাওয়ার কোন বাঁধা-ধরা পথ নেই। যতদূর সম্ভব গঙ্গার ধার ধরে যেতে হবে। ....এপারের পাহাড়গুলি অনেক জায়গায় একেবারে জলের ভেতর থেকে উঠেছে—তাই চলাচল আরো কঠিন।"...আর এক অংশে এই প্রসঙ্গেই লিখেছেন "...রাস্তা তৈরির প্রশ্নই ওঠে না, কেননা সারা বছরে এত কম লোক যায় যে, সেই কয়জনের সুবিধার জন্যে এত অর্থব্যয় করবে কে এবং কেন?..."

প্রায় তিন কিলোমিটার হাঁটার পর শিউলির দেখা পেলাম। ঘোড়া থেকে নেমে একটা চায়ের দোকানে অপেক্ষা করছে। এই পর্যন্তই ঘোড়া আসতে পারে। বাকিটুকু শ্রীচরণ ভরসা। একটু বিশ্রাম নিয়ে এবং শরীরের মধ্যে চায়ের ইন্ধন জুগিয়ে আমরা তিনজন চলতে শুরু করলাম।

এখন যে অংশ ধরে চলেছি, সে অংশটুকুতে পথের কোনো নির্দেশ নেই। ভাগীরথীর পাড় ধরে ছোট-বড়-বিরাট-বিশাল পাথরের চাঙরের উপর দিয়ে, মাঝ দিয়ে, পাশ দিয়ে, ডিঙিয়ে, লাফিয়ে কখনও বা হামাগুড়ির মতো করে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। বড় বড় পাথরের উপর চুনের দাগ দিয়ে পথরেখা চিহ্নিত করা হয়েছিল যাতে পরবর্তী যাত্রীদল চিহ্ন দেখে এগিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু কোথায়

সেই চিহ্নিত পাথর? স্থানচ্যুত হয়ে এদিক-ওদিকে গড়িয়ে পড়েছে। মুছে গেছে পথের চিহ্ন।

গোমুখ থেকে ফেরার পথে শিউলি আর গার্গী তো পথের রেখা হারিয়ে বড় বড় বোল্ডার ডিঙিয়ে উপরের দিকে বেপথে চলে গিয়েছিল। ওদের অবস্থা তখন করুণ রকমের সঙ্গীন। বুঝতে পারছে যে নিচের দিকে নেমে আসা উচিত, কিন্তু না পারছে নামতে, না পারছে নড়বড়ে বোল্ডারের উপর দিয়ে চলতে। যে কোনো মুহূর্তে ভারসাম্য হারিয়ে পতন এবং সাংঘাতিকভাবে আহত হওয়ার আশঙ্কা। আমি তখন বেশ নিচের দিকে অপেক্ষাকৃত ভাল অংশে এবং অবস্থা এমন যে এখান থেকে উপরের ওই অংশে চট্ করে যাওয়ার সম্ভাবনাও কম। কিন্তু ভগবান হয়তো আছেন। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালেন এক সাধু-বাবাজি। আগে তো ধারে-কাছে কোথাও কাউকে চোখে পড়েনি। তিনিই সস্নেহে ওদের হাত ধরে সমস্ত বাধা এবং বিঘ্ন পার করে একে একে সহজ জায়গায় নিয়ে এলেন। আমিও ক্রমে নিচের দিকের পথ ধরে ওদের দেখে দেখে এগিয়ে চলেছি। এক জায়গায় এসে আমরা যখন মিলিত হলাম, তখন পাথরের বুকে অন্যান্য যাত্রীদের পথচলার চিহ্ন চোখে পড়ল। অর্থাৎ এখন আর বেপথে নেই।

যাই হোক, গোমুখ যাওয়ার কথায় ফিরে আসি। সমস্ত বাধা পার হয়ে কষ্ট সহ্য করে শেষ অবধি আমরা গোমুখের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিলাম। ভেবেছিলাম এখানে নিদারুণ ঠাণ্ডা হবে। সেকরমই প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু এখানে আসতে আসতেই জ্যাকেট খুলেছি, মাফলার খুলে কোমরে বেঁধেছি, এবং এখন হাফ-সোয়েটার গায়ে রাখাও কষ্টকর হচ্ছে। বন্ধুর অ-পথে আসার সময় হারিয়েছি মাফলার।

অন্যান্য লেখায় এই পথে বরফের কথা পড়েছি। কেদারনাথ যাওয়ার সময় সেবারে আমরা রাস্তা থেকে বরফ তুলে নিজেদের মধ্যে ছোড়াছুড়ি করে খেলেছি। দু' জায়গায় তো বরফ কেটে পথ তৈরি হয়েছিল। দুপাশের খাড়াই বরফের প্রাচীরের মাঝ দিয়ে, বরফের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছি। এখানে পথের উপর এক টুকরো বরফেরও দেখা মেলেনি। কথাটা অনেকের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না, কিন্তু নিদারুণভাবে সত্যি। পরে কাগজে দেখেছি, এবারে শুধু ভারতেই নয়, সারা পৃথিবীতেই প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ বয়ে গেছে। আমেরিকায় ৫৩°-৫৪° সেলসিয়াস গরমে ৮০০ জনের উপর প্রাণ হারিয়েছেন। ইওরোপেও অস্বাভাবিক তাপপ্রবাহ জনজীবন বিপর্যয় এনে দিয়েছে।

·

বড় বড় পাথরের বাধা পেরিয়ে গোমুখে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু কোথায় গোমুখ? ভেবেছিলাম যেখান থেকে ভাগীরথীর উৎসরণ হচ্ছে সে অংশটার আকার একেবারে

গরুর মুখের মতো। কিন্তু সেরকম সাদৃশ্য তো চোখে পড়ছে না। হয়তো কোন এককালে উৎসরণ-মুখের সাথে গো-মুখের সাদৃশ্য ছিল, এখন আর তা নেই। তবে 'গো' কথাটার একটা অর্থ 'ধরিত্রী'। সেই অর্থে 'গোমুখ' কথাটি বলতে বোঝায় ধরিত্রীর উৎসমুখ। পাপহারিণী স্বর্গনদী গঙ্গা পাপী ধরাধামকে কলুষমুক্ত করতে যেখান থেকে উৎসারিত হয়েছেন সেটাই তো ধরিত্রীর উৎসমুখ—গোমুখ।

"এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি" নয়—বরঞ্চ বলা যায়—'এই সেই জনস্থান দূরবর্তী গঙ্গোত্রী হিমবাহ। এই হিমবাহের শিখরদেশ নিরন্তর নিবিড় তুষারে সতত আবৃত। অধিত্যকাপ্রদেশ উপলখণ্ডে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত রমনীয়। পাদদেশে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।...'

সামনেই গঙ্গোত্রী হিমবাহের শেষ অংশ। পাহাড়ের উচ্চতা অনুমান করা খুব সহজ নয়, তবুও মনে হয় সামনেই শ'চারেক ফুটের উঁচু হিমবাহের প্রাচীর। এবং তারই গায়ে বরফের প্রকাণ্ড গুহা। তারই ভেতর থেকে হিমবাহের বরফ-গলা জল বয়ে আসছে। সুরধুনী গঙ্গার আত্মপ্রকাশ। বেশি কাছে যেতে পারছি না। মাঝেমাঝেই বরফের চাঙড় খসে পড়ছে।

গোমুখের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎই ঝপ করে বিরাট একটি—বিরাট নয়, সুবিশাল বরফের অংশ হিমবাহের উপর থেকে ভেঙে পড়ল ভাগীরথীর উৎস-স্রোতে, এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় ভাগীরথীর জল এক-দেড়শো ফুট উঁচু হয়ে ছিটকে এল আমাদের কাছে। হিমবাহ ভেঙে জলে পড়ায় আওয়াজ, ভাগীরথীর জল উঁচু হয়ে ছলকে আমাদের ভিজিয়ে দেওয়া—সবকিছু হয়ে গেল পলকেই। অতএব আর বেশি এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে বলে মনে হয় না। এইভাবেই গঙ্গোত্রী হিমবাহ গলে ভেঙে পিছিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছর হিমবাহ যতটুকু এগিয়ে আসছে, তার চাইতে বেশি পিছিয়ে যাচ্ছে এজন্যই। এককালে গঙ্গার উৎসমুখ ছিল গঙ্গোত্রীতে,—এখন সেই উৎস আরো ১৮ কিলোমিটার উজানে, এই গোমুখে। এই কারণেই আগামী যুগে এই উৎস আরো পিছিয়ে যাবে। আজ আমরা ভোজবাসা থেকে চার কিলোমিটার হেঁটেছি, পরের যুগের যাত্রীদের আরো বেশি পথ পাড়ি দিতে হবে। কিংবা কে জানে কারিগরী প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে, আজ যেখানে শিউলি ঘোড়া থেকে নেমেছে, সে পর্যন্ত পাকা সড়কই হয়ে যাবে। যাত্রীদল সরাসরি ঐ পর্যন্ত এসে অল্প একটু হেঁটেই উৎসমুখ দর্শন করবেন। চলাফেরা যত সহজই হয়ে উঠুক না কেন, রোমাঞ্চকর অনুভূতির আনন্দটাই হারিয়ে যাবে। যাযাবরের কথাটাই একটু অন্যভাবে নতুন করে মনে পড়ে,—পাবো বেগ, চলে যাবে আবেগ।

চারিদিকেই নগাধিরাজ। কোনো গাইড নেই যে শৃঙ্গগুলি চিনিয়ে দেবে। তবে

ভগীরথ পর্বতের ডানদিকে শিবলিঙ্গ পর্বত (৬৫৪৪ মিটার অর্থাৎ ২১৪৬৪ ফুট) চিনতে পারছি। এটিকে চিনিয়ে দেওয়ার দরকার হয় না। এর আকৃতিই এর পরিচয়। তাছাড়া দূরে দৃশ্যমান মেরু পর্বত, ভৃগুপন্থ এবং আরো অনেক শিখর, যার নাম জানি না, কিন্তু সবগুলিই সূর্যের আলোয় ভাস্বর—নয়ন মনোহর।

একদিকে গঙ্গোত্রী—অপরপ্রান্তে বদরিনাথ। এর মাঝামাঝি অংশে চৌখাম্বা শিখর। এর চারটে শিখর থেকে উত্তর পশ্চিমে গঙ্গোত্রী হিমবাহ এবং উত্তর-পূর্বে শতোপন্থ হিমবাহ প্রবাহিত। এই হিমবাহ-অঞ্চল থেকেই উৎসারিত হয়েছে ভাগীরথী, মন্দাকিনী এবং অলকানন্দা। রুদ্রপ্রয়াগে মন্দাকিনী মিলিত হয়েছে অলকানন্দার সাথে এবং আরো কিছু দক্ষিণ-পশ্চিমে দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা-ভাগীরথী সঙ্গম। দেবপ্রয়াগ থেকেই মিলিত ধারার নাম গঙ্গা—যে নদী আর্যাবর্তের প্রাণপ্রবাহ। হরিদ্বার, কানপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী, পাটনা, ফরাক্কা হয়ে প্রবেশ করেছে আমাদের বাংলায়। তারপর দক্ষিণ প্রবাহিনী হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় আহিরণের কাছে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে এক অংশ পদ্মা নাম নিয়ে প্রবেশ করেছে অধুনা বাংলাদেশে এবং অপর অংশে বহরমপুর, কাটোয়া, নবদ্বীপ হয়ে কলকাতাকে ছুঁয়ে সাগরে পড়েছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর ২৪৬৪ কিলোমিটার বিরাট নদীর উৎসমুখ এবং মোহনামুখের অংশের একই নাম—ভাগীরথী। (শেষ অংশটুকুকে অবশ্য সাহেবরা নাম দিয়েছে হুগলী নদী—সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়)।

গোমুখে কোন মন্দির নেই। তাই পাণ্ডাও নেই, পূজারিও নেই। সেজন্যেই হয়তো যাত্রীসংখ্যা হাতে গোনা যায়। মাত্র দুজন যাত্রীকে স্নান করতে দেখলাম। জল বেশ ঘোলা এবং গভীরতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। উপলখণ্ডের উপরে বসে মন্ত্রোচ্চারণের সাথে তাঁরা পূতস্নাত হচ্ছেন। ভক্তপ্রাণ হিন্দু মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন গঙ্গার পবিত্রমুখে স্নান করলে সমস্ত পাপ—সমস্ত কালিমা দূর হয়ে যায়।

চারিদিকে হিমালয়—যোগীরাজের মতোই ধ্যানমগ্ন।

—'ভাগীরথী, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?'

—'মহাদেবের জটা হইতে।'

ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে বয়ে চলেছে ভগবতী গঙ্গে। অন্যান্য যাত্রীদের মতো শিউলি এবং গার্গী দুটি পাত্রে পবিত্র বারি ভরে নিল। ভেবেছিলাম ভাগীরথীর উৎসমুখে স্নান করব, কিন্তু হয়ে উঠল না। জল নিদারুণ হিমশীতল এবং ঘোলা। এই হিমশীতল জলই চোখে মুখে এবং মাথায় ছিটিয়ে নিলাম। এবং একটা জায়গায় স্থির হয়ে

বসে দুই তালুতে গঙ্গাজল নিয়ে পিতা ও পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে নিবেদন করলাম। গঙ্গোত্রীতে ফিরে গিয়ে তর্পণ করব।

গোমুখের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে গঙ্গোত্রী হিমবাহের খাড়াই প্রাচীর। তারই গায়ের বিরাট গুহামুখ থেকে ধূসর তরঙ্গভঙ্গে নির্গলিত হচ্ছে দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে।

এই গঙ্গাকে নিয়ে কতই না পৌরাণিক কাহিনী! মহাভারতে, হরিবংশে বা বিভিন্ন পুরাণের নানা আখ্যানে নানাভাবে গঙ্গার যে উল্লেখ পাই, তাতে আমাদের মতো সাধারণ লোকেরা খেই রাখতে পারি না। —গঙ্গা বিষ্ণুর তিন স্ত্রীর অন্যতমা।। গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাভিলাষিনী।। সোমবংশীয় রাজা জহ্নুকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য ব্যাকুলিনী।। এই গঙ্গাই আবার কুরুরাজ শান্তনুর স্ত্রী এবং দেবব্রত 'ভীষ্মের' জননী।। অন্য এক আখ্যানে নগরাজ হিমালয় ও তাঁর স্ত্রী সুমেরু-দুহিতা মেনকার কন্যা হিসাবেও গঙ্গার উল্লেখ পাই।। কিন্তু যে কাহিনী আমরা বেশি করে জানি, তা হলো সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রকে উদ্ধার করার জন্য স্বর্গনদী গঙ্গার মর্ত্যাবরণ।

এখন আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে আরো এগিয়ে গোমুখ ছাড়িয়ে আরো উঁচুতে তপোবন ও নন্দনবন। তপোবন চার কিলোমিটার ও নন্দনবন পাঁচ কিলোমিটারের কিছু বেশি। পথ আরো কিছুটা দুর্গম হলেও, কিছু উৎসাহী অভিযাত্রীক ওই দুই মনোরম স্থান দেখতে যান। ওখান থেকে শিবলিঙ্গ শিখরের দৃশ্য দারুণ সুন্দরভাবে দেখা যায়। শুধু শিবলিঙ্গ শিখর নয়, ওই দুই স্থান থেকে অপরূপভাবে চোখে ধরা দেয় ভগীরথ, মেরু, কেদারডোম, শতোপন্থ ইত্যাদি বিভিন্ন তুষারাবৃত শৃঙ্গ।

পথ দুর্গম হলেও হিমালয়ের টান অমোঘ টান। একবার এলে বারবার আসতে হয়। উত্তুঙ্গ শৈলশিখর, তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী, বিশাল-বিস্তৃত হিমবাহ, জল জঙ্গল, ঘন বনানী, প্রাণদায়িনী-নদী—তাদের শাখাপ্রশাখা, অসংখ্য ঝর্ণা ও ঝোরা, গভীরখাদ, সর্পিল পথ—সব কিছু মিলিয়েই হিমালয় যার তুলনা সে নিজেই। পৃথিবীর অন্যকোনও পর্বতশ্রেণী হিমালয়ের ধারে-কাছেও আসতে পারে না। তাই পথের দুর্গমতা অভিযাত্রিকের কাছে কোনো বাধাই নয়।

—'হিমালয় তো শুধু অভিযাত্রিকের নয়। সাধারণ তীর্থযাত্রীদের মধ্যে কতজন গোমুখে আসেন ?'

—'কতজন আর আসেন ? অতি নগণ্য। আমাদের এবারের অভিজ্ঞতাই তো

চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। ভোজবাসার বিশ্রাম-ভবনে আমরা ছিলাম ২৭ জন যাত্রী এবং খোঁজ নিয়েছি, লালবাবার আশ্রমে ছিলেন মাত্র ১৮ জন। অর্থাৎ মোট ৪৫ জন যাত্রী। গঙ্গোত্রী থেকে সকালে রওনা হয়ে সরাসরি গোমুখ দেখে ফিরে যাবেন কিছু সংখ্যক যাত্রী। সব মিলিয়ে গঙ্গোত্রীর মোট যাত্রীর অতি নগণ্য শতাংশই গোমুখে আসেন। অঙ্কের হিসাব তো তাই বলে। নয় কি ?'

পরিসংখ্যানকে নাকচ করি কেমন করে ? কথাটা ঠিক। গঙ্গোত্রীর বেশির ভাগ যাত্রীর কাছেই ভাগীরথীর উৎস দূরে থেকে যায়। গোমুখের পথ দুর্গম মনে করে অনেকেই সেখানে যান না। আমরা পথে কিছুটা কষ্ট পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু সেটুকু কষ্ট পার্বত্যপথে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অনেকে আবার উৎসাহী যাত্রীদের বারণ করেন। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "বহুদিন ধরে শুনে এসেছি, —গোমুখের পথ দারুণ দুর্গম। সাধু-সন্ন্যাসীরা যায়, —নইলে যাত্রীদের মধ্যে খুব কমই যেতে সাহস পায়।..." শঙ্কু মহারাজ লিখছেন... এবারে সন্ন্যাসী বিস্মিত কণ্ঠে বলেন—'আপনারা কি গোমুখ যাবেন নাকি ?' —'হ্যাঁ যাবো।' —'সে কি ? আমরা সাধু হয়ে যেতে পারলাম না, আর আপনারা...।' বছর দশ বারো আগে নবনীতা দেবসেন লিখছেন '...চারধাম যাত্রী শুনে বললেন—গোমুখে যেয়ো না যেন। খুব কষ্ট হবে। আমার নাতি কালই ফিরেছে, পা ফুলে নীল। ...বেটি, গোমুখ নেহি যানা।'

আমরা কিন্তু গোমুখে এসেছি। দুর্গামাতার এসব কাহিনী কোনোরকমেই আমাদের মনে ভয় জাগায়নি, কেন না বেশ ভালভাবেই মনে প্রত্যয় জেগেছিল যে আমরা যেতে পারবই। পেরেছি। সেকালের দুর্গমতা আজ বহুলাংশে সহজ হয়েছে। অল্প যেটুকু আছে হিমালয়ের পার্বত্যপথে সেটুকুও যদি সহ্য করতে না পারি, তাহলে তো এত তোড়জোড় করে হিমালয়ে আসার মানেই হয় না।

গোমুখের উৎস-মুখে এসে দাঁড়াতে পেরে মন ভরে উঠছে। কোনো এক শীতের মনোরম পড়ন্ত বিকেলে গঙ্গাসাগরে গঙ্গাকে লীন হতে দেখেছিলাম, আর আজ গ্রীষ্মের এক সকালে দেখছি ভগবতী গঙ্গের উৎসরণ। কোথায় বাংলার দক্ষিণপ্রান্তে গঙ্গাসাগর, আর কোথায় উত্তরপ্রদেশের উত্তরে হিমালয়ের উচ্চতায় গোমুখ !

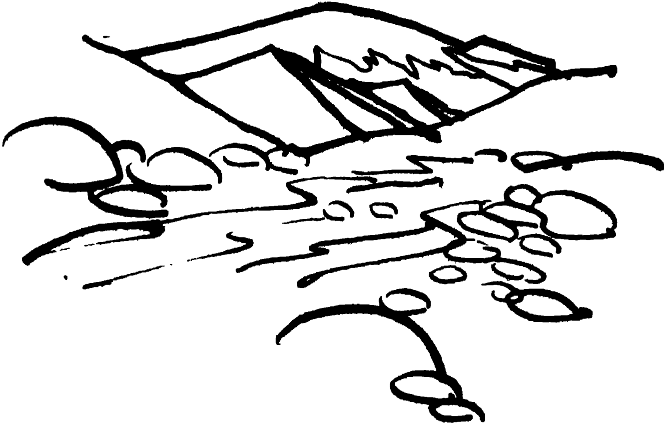
দেখছি দেখছি—আর দেখছি। দেখছি অমৃত লোকের বারতা নিয়ে পাপহারিণী-প্রাণদায়িনী গঙ্গা গোমুখ থেকে নেমে আসছেন ধরিত্রীর বুকে।

চারিদিকে শান্ত পরিবেশ। গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রাচীর থেকে মাঝেমাঝেই বরফের সুবিশাল চাঙড় ভেঙে পড়ছে। আরো কিছুক্ষণ বসে থাকতে পারলে ভাল লাগত। কিন্তু নাই—নাই যে সময়। ফিরতে তো হবেই। অতএব—।

ফেরার সময় শিউলি আর গার্গী বে-পথে চলে যাওয়ার জন্য বিভ্রাটের কথা আগেই বলেছি। শেষ পর্যন্ত সেখানে এসে পৌঁছলাম, যেখানে ঘোড়া নিয়ে দিলদার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। একটু হালকা খাবার ও গরম চায়ের পর গার্গীকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিলাম। ভোজবাসা গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে।

আমি আর শিউলি হাঁটতে শুরু করলাম। বেশ লাগছে ফিরতি পথে নামতে। উল্টোদিক থেকে কয়েকজন যাত্রী গোমুখ পানে চলেছেন। 'জয় গঙ্গা মাই কি!' বয়স্ক যাত্রী। 'আউর কিতনা দূর হায় বেটা?' আমরাও মা-গঙ্গার জয়ধ্বনি দিয়ে জানালাম—'ব্যস আ-হি গায়া।'

ওয়াটার-বটলের জল শেষ হয়ে গেছে। ঝর্ণাধারা থেকে শিউলি জল ভরে নিল—অবশ্যই জিওলিনের কয়েক ফোঁটা মিশিয়ে।





গোমুখ থেকে ফেরার পথে

ভোজবাসাতে শিউলি ঘোড়ায় চাপল—চিরবাসাতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। এবার পদব্রজে আমি আর গার্গী। ভোজবাসাতে আসার সময় কষ্ট পেয়েছিলাম, ফিরতি পথে সে কষ্ট প্রায় নেই বললেই চলে। তবে মাঝপথে ঝুরা-পাহাড়ের অংশে আশংকা ছিল, কখন না জানি মাথার উপর হুড়মুড়িয়ে পাথর এসে পড়বে। মাথার উপর ভেঙে না পড়লেও আগে-পিছে ছোট-ছোট পাথর খসে পড়তে দেখেছি।

চিরবাসাতে দুপুরের খাওয়া সারলাম। এবারে আমার ঘোড়ায় চাপবার পালা। ঘোড়ায় চাপব, তবে গদেরা অর্থাৎ লাগোয়া ঝোরা পার হয়ে। গতকাল যাবার সময় এত জল ছিল না, কিন্তু এখন কিছু বেলায় পাহাড়ের উপরের বরফ গলে জলের অবয়ব এবং তোড় হয়েছে বিপুল। পারাপারের জন্য ঝোরার উপর কাঠের গুঁড়ি ; কোনো রেলিঙও নেই। অনভ্যস্ত প্রচেষ্টায় আমাদের পক্ষে পার হওয়া নেহাৎই বিপজ্জনক। এই অবস্থায়, যেখানে গুঁড়ির উপর দিয়ে প্রবল বেগে স্রোত বইছে, সে অবস্থায় গুঁড়ির উপর দিয়ে ঘোড়ার পক্ষে পার হওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়। তাই ডানদিক দিয়ে, অর্থাৎ পাহাড়ের দিক দিয়ে, পাথর-ছড়ানো ঝোরার বুকের উপর দিয়ে, জলের তোড় ডিঙিয়ে অশ্বপুঙ্গবকে কোনোরকমে ওপারে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা। শিউলি ঘোড়ার পিছন পিছন যাওয়ার চেষ্টা করেও যেতে পারল না। ঘোড়ার লাগামের দুপাশে বাঁধা আছে আমাদের দুটো ছোট ব্যাগ।

মুহূর্তের মধ্যে কি যে হয়ে গেল। দুরন্ত স্রোতের মাঝে ছোট-বড় বোল্ডারের উপর ঘোড়ার পদস্খলন। সামলে ওঠার আগেই একটা ব্যাগ খুলে পড়ে গেল ভাগীরথীর দুর্দম জলপ্রবাহে। সহিস এবং আরো দু-জন পাড় ধরে ছুটলো যাতে ব্যাগটিকে উদ্ধার করা যেতে পারে। কিন্তু সেই দুরন্ত দুর্বার স্রোতস্বিনীর সাথে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। ভেসে গেল ব্যাগ। ব্যাগের সঙ্গে বেশ কিছু নগদ টাকা, একটা সোনার বালা, গরম চাদর এবং টুকটাক অনেক কিছু।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। শিউলির হাহাকারকে ভাগীরথীর উচ্ছ্বাস আমলই দিল না। কেশ এলাইয়া, বেণী দুলাইয়া তিনি বয়ে চলেছেন উচ্ছল হয়ে।

মা গঙ্গার আক্রোশ?

প্রত্যেক বছরই আমরা দেশের কোনো না কোনো অংশে বেড়াতে বার হই। কিন্তু কেন জানি না, এবারে শিউলি ভাগীরথীর উৎস-দর্শনে আসতে চাইছিল না। পুরানো লেখা পড়ে ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে গঙ্গোত্রী-গোমুখ পথটি এখনও দারুণ রকমের দুর্গম এবং এই বয়সে শরীরে ধকল সইবে না। ওকে বুঝিয়ে বলেছিলাম যে, অসুবিধা বা কষ্ট পথের দুর্গমতার জন্য যতটা না, তার চাইতে বেশি মনের জোরের অভাবের জন্য। সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে গেলে কষ্ট বা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া মা-গঙ্গার স্নেহদৃষ্টি তো থাকবেই। শেষ অবধি শিউলি কথাটা মেনে নিলেও বলে ফেলেছিল—'মা-গঙ্গার স্নেহদৃষ্টির কথা আর বোল না। উত্তরকাশী তো মা-গঙ্গার কোলে, তাহলে গতবছরে সর্বনাশা ভূমিকম্পে এত হানি হলো কেন? মা-গঙ্গা তাঁর নিজের খেয়ালে চলুন, আমরা আমাদের মতো যাব।' এছাড়াও আর একবার গঙ্গোত্রী যাওয়ার পথে উত্তরকাশীতে—গোমুখ যাওয়া প্রসঙ্গেই—মেজাজ হারিয়ে বিরক্তির সাথে বিছানার উপর ব্যাগ ছুঁড়ে ফেলেছিল। ব্যাগের মুখ খুলে ছিটকে পড়ে যায় টাকার বাণ্ডিল, গহনা এবং আরো কয়েকটা জিনিস। ভগবতী গঙ্গে কি তাই সবকিছু বাদ দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন সেই ব্যাগটি? মায়ের পক্ষে কি এরকম আক্রোশ শোভন? শুনেছিলাম, কুসন্তান হলেও কুমাতা কদাপি নয়। তাহলে?

টাকা ও গহনা ভেসে যাওয়ার দুঃখে শিউলি প্রায় কেঁদে ফেলেছে। গার্গী ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। হরিদ্বারে প্রথমদিন গঙ্গা স্নানের কথা মনে পড়ল। স্নান সেরে ওঠার মুখেই শিউলির হাত থেকে গামছা পড়ে নিমেষে ভেসে গেল। শিউলি হালকাভাবেই বলে উঠেছিল—'মা গঙ্গা, তোমাকে গামছা দিলাম।' পাশে স্নানরতা প্রবীণা মহিলা সকৌতুকে বলেছিলেন—'মা গঙ্গাকে লোকে হীরে-জহরৎ, সোনা-দানা দিয়ে থাকে, তুমি একটা পুরানো গামছা দিলে বাছা!'

মা-গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। হেসে খলখল, গেয়ে কলকল নেচে চলে যেন নটিনী।

'সকলই তোমারই ইচ্ছা' বলে আমি আর গার্গী সামলে নিয়েছিলাম কিন্তু শিউলি এল অবসন্ন ও discarded অবস্থায়। গঙ্গোত্রীতে যাত্রা-শেষে গঙ্গা-মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে সেই গঙ্গা-নিকেতনেই এসে উঠেছি। গোমুখ যাওয়ার আগে যখন আজকের জন্য ঘর বুক করতে চাইছিলাম, ম্যানেজার কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। সম্পূর্ণ টাকা অগ্রিম দিয়ে বাবা-বাছা বলে রাজি করিয়েছিলাম। ভাগ্যিস ঘর বুক করে গিয়েছিলাম, কেন না ফিরে এসে দেখলাম আশে-পাশে এন্তার যাত্রী গিজ গিজ করছে। মাঝরাতে উঠে দেখেছিলাম, বাইরের খোলা-বারান্দায় একদল দেহাতি-যাত্রী। কোনোরকমে মাথা গুঁজে পড়ে আছে। গায়ে চাপা দেওয়ার তেমন গরম কিছু নেই। ভোরের আগেই তারা উঠে চলে যায়। অবশ্যই কমন টয়লেটকে দুর্বিষহ রকমের নোংরা করে।





আবার গঙ্গোত্রী

পরশু'র চাইতে আজ যেন ঠাণ্ডা বেশি। লেপের উষ্ণ-আরামে ক্লান্ত-শরীরে রাতের ঘুম ভাল হয়েছিল। ঘুম ভাঙল খুব ভোর বেলায়। আমাদের ডেরা গঙ্গা-নিকেতন একেবারে গঙ্গানদীর উপরেই। (এখানে আর একবার বলে নেওয়া ভাল যে, 'ভাগীরথী' ও 'গঙ্গা' আমাদের কাছে সমার্থক।)

সামনে একটু প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সেখানে সাজানো টেবিলের মাথায় বাগান-ছাতা। ঘের-দেওয়া রেলিঙের নিচেই গঙ্গার প্রবল প্রবাহ। রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। নীচে গঙ্গার উল্লাস—উচ্ছ্বাস। করুণাধারা ঢালবার জন্য পাষাণ কারা ভেঙে উছলি উঠিছে—দারুণ রোষে নয়—বাঁধনহারা হর্ষে।

গঙ্গা।

গোমুখ থেকে উৎসারিত হয়ে, ভারতের বিরাট অঞ্চল বিধৌত করে গঙ্গাসাগরের কাছে সাগরে বিলীন হয়েছে। ২৪৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারতের প্রধানতম নদী। দুই তীরে গড়ে উঠেছে তীর্থস্থান, রাজ্য রাজধানী ও জনপদ। ভারতের আত্মিক সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে এই গঙ্গাকে ঘিরেই। আজকের যুগে এর তীরে গড়ে উঠেছে বহু শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র।

রেলিঙে ভর দিয়ে গঙ্গাকে দেখছি আবছা ভোরের নরম মোলায়েম আলোয়। দেখেও আশ মিটছে না। শিউলি আর গার্গী পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গোমুখ

যাতায়াতের ক্লান্তি শরীর থেকে এখনও পুরোপুরি যায় নি, কিন্তু গঙ্গোত্রীর বুকে, মা গঙ্গার কোলে দাঁড়িয়ে, মন্দির থেকে ভেসে আসা মন্ত্রোচ্চারণের সাথে সুরধুনীর কলতালের ঐকতান মন ভরিয়ে দিল।

অনেককাল আগে গঙ্গোত্রী হিমবাহ এখানে বিগলিত হয়ে গঙ্গা বা ভাগীরথীর সূচনা করত। অর্থাৎ, এককালে হিমবাহ প্রান্ত এখানেই ছিল, এখান থেকেই গঙ্গার উত্তরণ হতো—তাই স্থানের নাম গঙ্গোত্তরী—গঙ্গোত্রী। আমি এতদিন এরকমই জানতাম। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের পর্যটন দফতরের প্রচার-পুস্তিকায় লেখা আছে দেখলাম—"The Bhagirathi flows here for a while in a north-wardly direction and hence the place is called Gangotri...." অর্থাৎ এখানে ভাগীরথী উত্তর প্রবাহিনী, তাই স্থানের নাম গঙ্গোত্রী। যাই হোক, আমার ধারণাই আমার কাছে অটুট। এখন অবশ্য এই অঞ্চল গঙ্গার উত্তরণ-স্থান নয়। ভূতাত্ত্বিক-ভৌগোলিক কারণে গঙ্গোত্রী হিমবাহ ক্রমশ ১৮ কিলোমিটার পূর্বে পিছিয়ে গেছে এবং এই উৎসমুখও বর্তমানে গোমুখ থেকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ-পূর্বে সরে যাচ্ছে।

সামনে লোহার পাকা-পুল। ওপারেই গোমুখের দিকে মুখকরা প্রায় পূর্বমুখী গঙ্গামন্দির। পুজোপাঠের আওয়াজ আসছে। বস্তুত, মন্দিরের প্রাত্যহিক কাজ শুরু হয় ভোর চারটের সময় এবং শেষ হয় রাতের শয়নারতিতে। একটা জিনিস আগের দিন খেয়াল করেছিলাম, মধ্যবিত্ত ঘরোয়া গৃহিনীদের মতো গঙ্গাদেবীরও দুপুর দুটো থেকে দিবানিদ্রার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা আছে।

জনজীবন জেগে উঠেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা মন্দিরে গেলাম। শুচি-স্নাত না থাকার জন্য শিউলি-গার্গী গত পরশু পুজো দেয়নি। স্নান করে আসা সত্ত্বেও, পুজো দেওয়ার আগে গঙ্গার জলে হাত ধুয়ে মাথায় জলের স্পর্শ নিয়ে নিল। আমি পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। এক প্রবীণা মহিলা আমাকে বললেন—'বাছা, তুমি পুজো দেবে না, শুদ্ধ হবে না?'

আমি তখন চারিদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। ভদ্রমহিলা হয়তো ভেবেছেন গঙ্গাজলের মাহাত্ম্যে আমার বিশ্বাস নেই। আমাকে 'বাছা' বলায় গার্গীর কি হাসি। ভদ্রমহিলা আবার বললেন—'পুজো না দাও বাছা, গঙ্গার জলে শুদ্ধ হয়ে নাও। জানো তো, বিষ্ণুপদী গঙ্গাজলে স্নানে পুণ্য, পানে পুণ্য—স্পর্শেও পুণ্য।' গার্গী মুখ টিপে হাসছে। পাশ থেকে খুব ধীরে ধীরে বলল—'এত সহজে পুণ্যিলাভের সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। মাথায় পুণ্যবারি ছুঁইয়ে নাও।' শিউলিও হাসছে। অতএব সুযোগ হাতছাড়া করলাম না।

পুজো দেওয়ার জন্য ছোট একটা লাইন পড়েছে। ওরা যখন লাইনে দাঁড়িয়ে

তখন আমি চাইছিলাম মন্দির-অঙ্গনের বাইরে আরো কিছুটা উত্তর-পূর্বে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে বিভিন্ন কোন থেকে মন্দির এবং আশেপাশের অংশ মিলিয়ে সামগ্রিক একটা ছবি নেব। জুৎসই জায়গা পাওয়া গেল, এবং ছবিও তোলা হলো।

গঙ্গোত্রী মন্দিরের চেহারা অতি সাধারণ। বর্তমান মন্দিরটি বেশিদিনের জন্য না হলেও এই স্থানে গঙ্গা-মন্দির সম্ভবত পৌরাণিক-কাল থেকেই আছে। হয়তো এপারে, অর্থাৎ ডানতীরে না থেকে ছিল গঙ্গার বাঁ-তীরে—ওপারে। প্রায় সাড়ে-পাঁচ হাজার বছর আগে ভগীরথের তপস্যার জোরে এখানে গঙ্গাবতরণ হয়েছিল, যার ছোঁয়ায় ষাটহাজার সগর-সন্তান মুক্তিলাভ করে স্বর্গে গমন করেছিল। স্বাভাবিকভাবে প্রায় সে সময় থেকেই গঙ্গা-উপাসনার জন্য মন্দিরের মতো কিছু গড়ে ওঠার সম্ভাবনার কথা নেহাৎ অবাস্তব নয়। কিংবদন্তীও বলছে, কুরুক্ষেত্রের রক্তক্ষয়ী মহাসমরের পরে আত্মীয়-স্বজনের আত্মার মুক্তির জন্য পঞ্চপাণ্ডবেরা এখানে এসে তর্পণ করেছিলেন।

সগর সন্তানদের মুক্তিলাভের কাহিনী তথা গঙ্গার মর্ত্যাবরণ ভক্তপ্রাণ হিন্দুদের কাছে পরম-বিশ্বাসের আখ্যান। কিন্তু বহু যুক্তিবাদী আধুনিক বিশ্লেষক গঙ্গাকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত নিয়ে আসার ঘটনাকে একটি ব্যাপক সেচ-পরিকল্পনা হিসাবে দেখে থাকেন। এই সেচ-যোজনা আরম্ভ করেছিলেন ভগীরথের পিতামহ অংশুমান—তাঁর ঠাকুরদা সগর রাজার পরিকল্পনা অনুসারে। অংশুমানের পরে Project Engineer হন তাঁর পুত্র দিলীপ। দিলীপ কাজ বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যান এবং যোজনার পরিসমাপ্তি ঘটে তাঁর সুযোগ্য পুত্র ভগীরথের হাতে।

সে যাই হোক, বর্তমান যুগে মন্দিরটি তৈরি করেন গোর্খা কমান্ডার অমর সিং থাপা। ("...The shrine of Bhagirathi was erected by Amar Singh Thapa, the Gorkha Commander early in the 18th century..." —U. P. Tourism).

গার্গী বলল—'উত্তরপ্রদেশ পর্যটন দফতরের তথ্য না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু মন্দিরের শীর্ষে গম্বুজ কেন ?

শিউলি যোগ করল—'ঠিকই তো। গম্বুজ তো স্পষ্টই ইসলামিক স্থাপত্যের নিদর্শন। তাই না ?'

—'খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। অমর সিং থাপার তৈরি মন্দিরের সংরক্ষণের প্রয়োজন হলে এগিয়ে আসেন জয়পুরের মহারাজা। খেয়াল রাখতে হবে, জয়পুর তখন দিল্লীর ছত্রছায়ায় এবং সেখানকার স্থাপত্যে ইসলামি শৈলীর ছোঁয়া লেগে গেছে। তাহলে বুঝতেই পারছ জয়পুরের মহারাজার হাতে নব-সংরক্ষণের সময় মন্দির-শীর্ষে গম্বুজের অবস্থান হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

শিউলি যখন পুজো দিচ্ছে, তখন আমার আর পুজোর লাইনে দাঁড়িয়ে পুজো দিতে যাওয়ার দরকার কোথায়? এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রেই তো বিধান দেওয়া আছে সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য। মহিলারা বোধহয় তেমনভাবে শাস্ত্রপাঠ করেন না, তাই ওরা ছাড়ল না। অগত্যা, আমাকেও লাইনে দাঁড়াতে হলো।

খেয়াল করে দেখলাম পুজো দেওয়ার জন্য যাঁরা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের ডালিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ফুল নেই। পুজোর ফুল বলতে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে প্রধানত গাঁদা ও জবা সঙ্গে বিল্বপত্র ও তুলসীপাতা। এখানে ফুল কোথায় পাবে? এবং বিল্বপত্র? তা-ও পাওয়া যায় না। একগাদা তুলসীপাতা আছে, কিন্তু এই তুলসী সেই তুলসী নয়। এখানে পথের পাশে, পাহাড়ের খাঁজে, গোমুখের পথে এই 'তুলসীর' প্রচুর ঝোপঝাড় দেখেছি। আমাদের চেনা তুলসীর গন্ধ নেই—একটা হালকা মিষ্টিমতো গন্ধ আছে। পরিচিত তুলসীর বিকল্প—'গঙ্গা-তুলসী'।

লাইন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। নানা আলাপ শুনছি—আজ তো ভীড়ই নেই, পরশুর ভীড় কল্পনা করতে পারবে না। সেদিন ছিল গঙ্গা-দশহরা—সে কি যাত্রী সমাগম! চারদিক গমগম করছে। সারা প্রাঙ্গণে—।

তাই! অব সমঝা। সেজন্যই পরশুদিন গঙ্গোত্রীতে একটু বেলা করে পৌঁছনোর পথে দলে দলে যাত্রীদের ফিরতে দেখেছিলাম। বহু বাস ও গাড়ি বোঝাই হয়ে যাত্রীদল ফিরে চলেছিলেন গঙ্গা-পুজো দিয়ে। অর্থাৎ গঙ্গোত্রীতে দারুণ রকমের যাত্রী সমাগম হয়েছিল আমরা এখানে এসে পৌঁছনোর আগের দিন—৭ই জুন, নবমীতে।

অন্যান্য সব জায়গায় দেখেছি আগত যাত্রীদের একটা বড়ভাগ বাঙালি-যাত্রীর। কিন্তু আজ এখানে, এই পুজোর লাইনে মাত্র কয়েকজন বঙ্গসন্তানের দেখা মিলল। বেশিরভাগ যাত্রীই বিহার-উত্তরপ্রদেশ-রাজস্থানের বয়স্ক-বয়স্কা পুরুষ-মহিলা। তাদের মধ্যে আবার দেহাতীদের সংখ্যাধিক্য।

শিউলি বলল—'ভাগ্যিস এই দেহাতীরা আছেন; সেজন্যে দেব দেবীর দুমুঠো খাবার জুটছে।

গার্গী বলল—'ব্যাপারটা আরো সহজভাবে ভাবা যেতে পারে। অন্যান্য জায়গায় যে সব বাঙালি বেশি সংখ্যায় যান, তাঁরা পর্যটক। আর এখানে যাত্রীদল আসেন নি—এসেছেন পুণ্যার্থীর দল।'

আমি বললাম—'তাহলে আমরা কি? যাত্রী না পুণ্যার্থী?

গার্গীর উত্তর—'একের মধ্যে দুই। যাত্রী কাম পুণ্যার্থী।'

সকাল প্রায় আটটা। এবারে এতো অশালীন রকমের গরম যে, এই ১০৩০০ ফুট উচ্চতাতেও এখন শ্রীঅঙ্গে হাফ-হাতা সোয়েটার না রাখলেও চলে। গঙ্গোত্রীর বুকে এই দারুণ গরমের কথা অনেকের কাছেই হয়তো বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না, কিন্তু ১৯৯৫ সালের জুন মাসে কথাটা নিদারুণভাবে সত্যি। অথচ পরশু সন্ধ্যাতে মন্দির-প্রাঙ্গণে গল্প করতে করতে এক মীরাট-বাসিনী বলছিলেন, বছর কয়েক আগে যখন এসেছিলেন, তখন ভৈরবঘাঁটির পরে পথ বরফাবৃত ছিল। সীমা-সুরক্ষা বাহিনীর লোকেরা বরফ কেটে সরিয়ে দেওয়ার পর তাঁদের আসতে হয়েছিল। আগের দিন যে দোকান থেকে গোমুখ-যাত্রার জন্য লাঠি ভাড়া করেছিলাম সেই দোকানী বলেছিল সে তাঁর জিন্দগীতে অর্থাৎ পিছলে চালিশ সালমেঁ এরকম দেখেননি। জুনের প্রথমেও অন্যান্যবার আশেপাশে বরফ থাকে। কিন্তু এবারে কোথায় বরফ? দূরের পর্বতশীর্ষ শুভ্র-তুষার-কিরিটিনী, কিন্তু এখানে দারুণ অগ্নিবাণের—।

চারদিকেই পাহাড়। পাহাড় নয়—পর্বতশ্রেণী। একটার পর একটা ধূসর হতে হতে দূরে মিলিয়ে গেছে। মাঝে গঙ্গার কোলে উপত্যকার মতো অংশ। রুক্ষ পর্বতশ্রেণী নয়—দেওদার, পাইন ও অন্য চিরহরিৎ বনানীর শ্যামলাঞ্চল।

হঠাৎ আওয়াজ উঠল—'গঙ্গা মাইকি জয়!' নতুন একদল তীর্থযাত্রী এসে পৌঁছেছেন। তারই সাথে একঝলক হাওয়া আমাদের আলিঙ্গন করল। ভারি ভাল লাগছে। একেই বোধহয় মৃদুমন্দ পবন বলা হয়।

একসময় আমরাও পৌঁছে গেলাম গর্ভগৃহের কাছে। দেয়ালে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে মন্দিরাভ্যন্তরে অর্থাৎ যেখানে বিগ্রহ আছে, সেখানে রাওয়ল পূজারি ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারে না।

অন্যান্য মন্দিরে যা হয়ে থাকে, এখানেও তাই হলো। অর্থাৎ ডালি থেকে কিছু নামিয়ে একটা প্রসাদীফুল দিয়ে ডালি ফিরিয়ে দিল। তবে হ্যাঁ, কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিয়েছিলেন, এবং পাশ থেকে একজন প্রসারিত হাতের তালুতে চরণামৃত ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন।

গর্ভগৃহের মূলস্থানে মা-গঙ্গায় শিলা-বিগ্রহ। মকর বাহিনী, চতুর্ভুজা, শুক্লবর্ণা। এছাড়া আরো একটি রৌপ্য-বিগ্রহও আছে। কেদার-বদরির মতো এই মন্দিরটিও শীতকালে বন্ধ থাকে। তিথি-নক্ষত্র বিচার করে মন্দির-কমিটি শীতশেষে দ্বারোদ্ঘাটন এবং শীতকালে দ্বার বন্ধের দিনস্থির করে। দ্বার বন্ধ হলে সেই রৌপ্য-বিগ্রহ

শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হয় মুখিমঠে (চলতি কথায় মুখোবা) এবং শীতের সময় সেখানেই পূজার্চনা হয়। হরসিল ও জংলাচটির মাঝামাঝি ধরালি। ভাগীরথীর এপারে ধরালি এবং ওপারে মুখিমঠ।

মূলগর্ভগৃহে গঙ্গামূর্তি ছাড়া গণেশ-সহ স্থান পেয়েছেন দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা, যমুনা ও জাহ্নবী। ভগীরথ—যিনি গঙ্গাকে মর্ত্যে এনেছিলেন, তিনিও আছেন। স্পষ্টই এটি পরবর্তী সংযোজন।

পুজো দিয়ে বাইরে এলাম। মন্দিরদ্বারের উপরের দিকে এবং পাশেও নানা বর্ণের কাপড়ের টুকরো ঝুলছে৷ মানতের নিদর্শন। মূল প্রাঙ্গণ থেকে সিঁড়ি ভেঙে নামতেই আর একটি বাঁধানো চত্বর। চত্বরের ঠিক মাঝখানে নয়, একটু বাঁদিক ঘেঁষে ষটকোণ শিলার উপর ছোট-খুবই ছোট একটা মন্দির—ভগীরথ মন্দির। ভিতরে ভগীরথের ছোট পিতলমূর্তি। কিংবদন্তী অনুযায়ী মর্ত্যে গঙ্গা আনয়নের জন্য এখানে উপবিষ্ট হয়ে ভগীরথ কঠোর তপস্যা করেছিলেন। একটি প্রবন্ধে অবশ্য পড়েছি যে, ভগীরথ তপস্যা করেছিলেন শিবলিঙ্গ পর্বতের পাদদেশে তপোবনে।

অনেককাল আগেকার কথা। সূর্যবংশীয় রাজা সগর শততম অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং যজ্ঞাশ্বের ভার ছিল তাঁর ষাট হাজার পুত্রের উপর। সগর রাজার শততম যজ্ঞের খবরে ইন্দ্র ভীত হয়ে পড়েন এবং মনে করেন যে, এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হলে হয়তো সগর রাজা তাঁর ইন্দ্রত্ব দখল করবেন। অতএব, যজ্ঞ যাতে সুসম্পন্ন না হয়, সেজন্য তিনি কৌশলে অশ্বটিকে হরণ করে কপিল মুনির পাতালস্থিত আশ্রমে রেখে আসেন। অশ্বরক্ষক ষাট হাজার সগরপুত্র অপহৃত অশ্বের খোঁজ করতে করতে পাতালে কপিল-আশ্রমে (বর্তমানে যেখানে গঙ্গাসাগর, সেই স্থানকে পাতাল বলা হতো) যজ্ঞাশ্ব দেখতে পেয়ে তাঁকে অশ্বচোর মনে করে লাঞ্ছিত করলে কপিলমুনির যোগানলে তারা ভস্মীভূত হয়ে যায়। এদিকে অনেকদিন যাবৎ অশ্বের সংবাদ না পেয়ে সগররাজা তাঁর নাতি অংশুমানকে (অসমঞ্জের পুত্র) অশ্বের সন্ধানে পাঠান। খোঁজ করতে করতে পাতালে এসে সবকিছু অবগত হয়ে স্তবস্তুতিতে কপিলকে সন্তুষ্ট করে অশ্ব ফিরিয়ে আনেন এবং যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়। এদিকে বেঘোরে গতপ্রাণ পিতৃব্যদের আত্মার সদগতির ব্যবস্থা করতে হয়। কপিলমুনির কাছে অংশুমান জানতে পারলেন যে, পিতৃব্যদের ভস্মরাশি যখন স্বর্গ থেকে নিয়ে আসা গঙ্গার পবিত্র ধারার পরশ পাবে, তখনই তাঁর পিতৃব্যকুল মুক্তিলাভ করবে।

অংশুমান গঙ্গাকে আনতে পারেন নি। তাঁর পুত্র দিলীপ সফল হতে পারলেন না। দিলীপের পরে তাঁর পুত্র ভগীরথ কপিল-কোপানলে ভস্মীভূত পিতৃপুরুষদের উদ্ধারার্থে কঠোর তপস্যা শুরু করেন। তপস্যায় প্রীত হয়ে অন্যবরের সাথে ব্রহ্মা বললেন, গঙ্গাবারির পূতস্পর্শে তাঁর পিতৃপুরুষেরা উদ্ধার হবেন ঠিকই, কিন্তু গঙ্গার পতনবেগ এই ধরিত্রী সহ্য করতে পারবে না। একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেব এই বেগ ধারণ করতে সক্ষম। ভগীরথ তখন মহাদেবকে তুষ্ট করতে তপস্যায় বসলেন। পৌরাণিক গাথা এবং লোক-পরম্পরায় কিংবদন্তী বলে এই সেই তপস্যাস্থল। এখানেই গঙ্গাবতরণ হয়েছিল। পাতালে অর্থাৎ বর্তমান গঙ্গাসাগরের কাছে কপিল-কোপানলে ভস্মীভূত সগররাজার ৬০ হাজার পুত্র পাপহারিণী-প্রাণদায়িনী গঙ্গার পবিত্র পরশ পেয়ে মুক্ত হয়ে স্বর্গলাভ করে। ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়ন করেছিলেন বলে গঙ্গার এক নাম ভাগীরথী।

কিন্তু গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করার জন্য ভগীরথকে ব্রহ্মার তপস্যা কেন করতে হলো ?

সে আর এক কাহিনী। দেবর্ষি নারদের সংগীতজ্ঞ হিসাবে অহঙ্কার ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর তালভঙ্গ হতো, অথচ অহঙ্কারে লীন হয়ে তিনি তা বুঝতে পারতেন না। তাই নারদের গর্ব খর্ব করার জন্য রাগ-রাগিনীরা বিকলাঙ্গ নরনারীর আকারে তাঁর যাত্রাপথের পাশে পড়ে থাকে। নারদ আপন খেয়ালে গুনগুন করে হরিনাম করতে করতে চলেছিলেন। পথে তাদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং বললেন—'কি ব্যাপার ! তোমরা পথের পাশে এভাবে পড়ে আছ কেন ?'

তাঁরা বললেন—'আমরা রাগ-রাগিনী। নারদ নামে একজন নিজেকে সবচাইতে বড় সংগীতজ্ঞ মনে করে, অথচ জানে না যে, তার সঙ্গীতে প্রায়ই তালভঙ্গ হয়। সেই তালভঙ্গের কারণেই আমরা বিকলাঙ্গ।'

নারদ মানসিকভাবে থমকে গেলেন। বলে কি এরা ! আমি তালকানা ! তারপর ভাবলেন, ঠিক আছে, দেখাই যাক ব্যাপারটা কিভাবে গড়ায় ! তিনি তখন বললেন—'তাই নাকি ? তাহলে তো বড়ই দুঃখের ব্যাপার। তা 'কি উপায়ে তোমাদের এই বিকলাঙ্গতা দূর হতে পারে।'

তাঁরা বললেন, তাঁদের যদি যথার্থ সঙ্গীত শোনানো হয়, তাহলেই তাঁরা পূর্বরূপ ফিরে পাবেন এবং একমাত্র স্বয়ং মহাদেব ছাড়া যথার্থ ও শুদ্ধ সঙ্গীত পরিবেশন আর কেউ করতে পারবেন না।

মহাদেবকে নারদ এই অনুরোধ জানালে তিনি সংগীত পরিবেশনে সম্মত হলেন, কিন্তু তার জন্য প্রকৃত সমঝদার শ্রোতা চাই। এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুই সমঝদার শ্রোতা। তাঁরা শ্রোতা হয়ে এলেন।

মহাদেব শুদ্ধ রাগ-রাগিনীতে সঙ্গীত পরিবেশন শুরু করলেন—সে রাগরাগিনী বিশ্বপ্লাবিনী এবং অমৃত উৎসধারা। কৈলাসশিখর হতে মহাদেবের মহাসঙ্গীতের মূর্ছনা ভূলোক-দ্যুলোক-গোলকে ছড়িয়ে পড়ল। নারদ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন সংগীত কাকে বলে। অনুভব করলেন—সে রাগিনী যেন গগন ছাপিয়া / হোমশিখাসম উঠিছে কাঁপিয়া / অনাদি অসীমে পড়িছে ঝরিয়া / বিশ্বতন্ত্রী হতে। রাগ-রাগিনীর দল পূর্ব কলেবর ফিরে পেলেন। একাগ্র হয়ে সঙ্গীত শুনছিলেন বিষ্ণু। সেই বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর অনাদি ধ্বনি ভাসিয়ে দিল তার হৃদয়-তরণী। বিপুল হর্ষে তিনি দ্রবীভূত হয়ে গেলেন। দ্রবীভূত বিষ্ণুকে ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলুতে ধারণ করে রাখলেন। সেই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা নামে খ্যাত।

এই জন্যই গঙ্গাকে আনয়ন করার জন্য ভগীরথকে প্রথমে ব্রহ্মার তপস্যা করতে

এই সেই পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা। ভাগীরথীর বুকে উপলখণ্ডের উপর বসে অনেকে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করছেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পরে পঞ্চপাণ্ডবেরাও এখানে এসেছিলেন নিহত আত্মীয় স্বজনের উদ্দেশে তর্পণ করতে।

নিচের এই চত্বরের সামনের দিকে দুপাশে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে ভাগীরথীর বুকে। সামনে কিছুটা জলের পরে আবার উপলাকীর্ণ বালুর বিস্তার। তারপর আবার জল। সেখানে পিণ্ডদান হচ্ছে—তর্পণ হচ্ছে। এখানে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করার ইচ্ছে আমার ছিল, কিন্তু একজন বয়স্ক যাত্রী বলেছিলেন পিতার মৃত্যুর একবছর পূর্ণ না হলে এখানে নাকি তর্পণ করতে নেই।

ধর্মীয় অনুশাসন জানি না। পিতৃপুরুষদের তৃপ্ত করার জন্য যে কোনো সময়ে তর্পণ করতে বাধা কোথায় ? এখানে আর সেকথা তুলে সৌম্যকান্তি যাত্রীর কথা অবহেলা করলাম না। গতকাল গোমুখে—গঙ্গার উৎমুখে দিবাকর সূর্যের দিকে তাকিয়ে অঞ্জলি ভরে পবিত্রবারি উৎসর্গ করেছিলাম আমার পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে। সেই সহজ উৎসর্গই আমাকে শান্তি দিয়েছে।

আমরা স্নান করতে পারলাম না। দশজনে বলে থাকেন গঙ্গাজলে স্নানে পুণ্য, পানে পুণ্য—গঙ্গাসলিল পরশেও পুণ্য। আমরা তাই আর একবার হাতে চোখে মুখে নিলাম পুণ্যতোয়ার শান্ত পরশ।

পাহাড়, নদী, মন্দির—বিস্তীর্ণ এক পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছি। জলের গভীরতা না থাকলেও ওরই মাঝে অনেকে স্নান করছেন। একজন ভদ্রলোকের গলায় শংকরাচার্যের গঙ্গা-বন্দনার পরিচিত স্তোত্র—দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে / ত্রিভুবন তারিণী...

গঙ্গোত্রী-

এবার ফেরার পালা।

গঙ্গোত্রী যাওয়ার সময় গিয়েছিলাম প্রবাহের উজানে। ফিরতি পথে গঙ্গা আমাদের সহযাত্রিনী। ভগীরথ শঙ্খধ্বনি সহকারে গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবারে কলধ্বনির সাথে গঙ্গা এগিয়ে চলেছে। আমরা চলছি পিছে-পিছে।

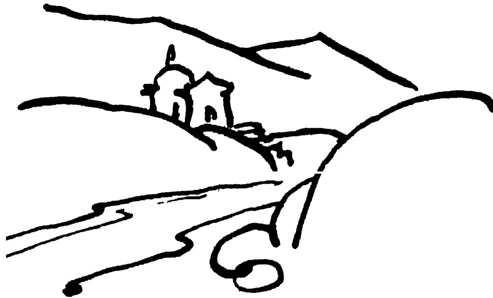
গোমুখ থেকে উৎসারিত হয়ে প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটারের যাত্রাপথে বহু ছোট-বড় শাখানদীকে পরম মমতায় বুকে টেনে নিয়ে দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গের বিগলিত করুণা তীর্থ-বরদ-বঙ্গে এসে গঙ্গাসাগরে বিলীন হয়েছে।

একই গঙ্গা ঘাটে ঘাটে।

গোমুখে দেখলাম উৎসরণ, হরিদ্বারে অবগাহনে শরীর মন শীতল হয়েছে, প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছি, ফরাক্কায় দেখেছি ব্যারাজ তৈরির কর্ম-তপস্যা। মুর্শিদাবাদ জেলায় আহিরণের কাছে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পদ্মা নামে একাংশের বাংলাদেশে প্রবেশের বিষন্নরূপ এবং দক্ষিণ প্রবাহিনী অপর অংশে ভাগীরথীর প্রেমস্পর্শ পেলাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে। কলকাতা-হাওড়ার দক্ষিণেশ্বর-বেলুড়ে মন ভরিয়ে দিল তার মাতৃমূর্তি-স্নেহসুকোমল হাসি। দেখেছি গঙ্গানদীর মোহনায় গঙ্গাসাগরে মকর-সংক্রান্তির মেলায় অসমুদ্র-হিমাচল ভারতবাসীর মহামিলন।

ভাবতে ভাল লাগছে, গোমুখের উৎসরণ থেকে গঙ্গাসাগরে মুক্তধারা, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে আমি এই গঙ্গার রূপ দেখেছি। এই খুশির রেশ নিয়ে আমরা ফিরে চলেছি। জিজ্ঞাসা করলাম—'গঙ্গা, তুমি কোথায় যাইতেছ?'

গঙ্গার কলধ্বনি উত্তর দিল—"তীর্থ-বরদ-বঙ্গে।"

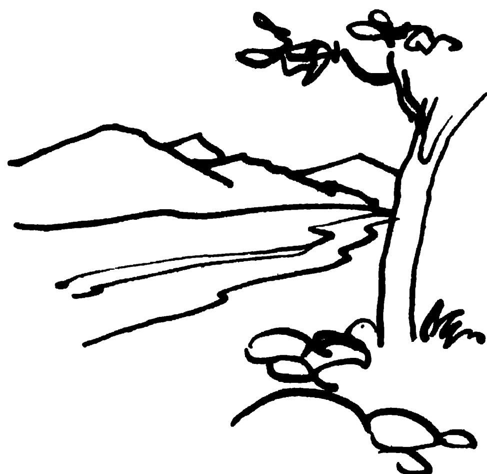


প্রাসঙ্গিক তথ্য

স্থান	দূরত্ব	থাকবার জায়গা
হরিদ্বার	—	টুরিস্ট বাংলো, ছোট-বড়-মাঝারি হোটেল, প্রচুর ধর্মশালা, পি. ডবল্যু. ডি. ইনসপেকসন হাউস, ফরেস্ট রেস্ট হাউস।
ঋষিকেশ	২৪	টুরিস্ট বাংলো, পি. ডবল্যু. ডি. ইনসপেকসন হাউস, ফরেস্ট রেস্ট হাউস, বড় মাঝারি হোটেল, ধর্মশালা।
নরেন্দ্রনগর	৪০	পি. ডবল্যু. ডি. বাংলো, হোটেল।
চাম্বা	৮৫	টুরিস্ট বাংলো, ফরেস্ট রেস্ট হাউস।
টেহরী	১০৬	
ধরাসু	১৪৮	
উত্তরকাশী	১৭৬	টুরিস্ট রেস্ট হাউস, ট্রাভেলর্স লজ, ফরেস্ট বাংলো, পি. ডবল্যু. ডি. ইনসপেকসন হাউস, বিড়লা ধর্মশালা, পাঞ্জাব-সিন্ধ ক্ষেত্র, বাবা কালি কমালি ধর্মশালা এবং বেশ কিছু বড় ও অনেক মাঝারি হোটেল।
গাঙ্গোরি	১৮০	
ভাটওয়াড়ি	২০৫	পি. ডবল্যু. ডি. ইনসপেকসন হাউস, ফরেস্ট বাংলো।
গাংনানি	২২০	
সুখি	২৩৪	
ঝালা	২৪১	
হরসিল	২৪৭	
লংকা	২৬১	ট্রাভেলর্স লজ।
ভৈরবঘাঁটি	২৬৪	ট্রাভেলর্স লজ, পি. ডবল্যু. ডি. বাংলো এবং ফরেস্ট হাউস।

ধর্মশালা।

গঙ্গোত্রী	২৭৩	ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস, পি. ডবল্যু. ডি. বাংলো, ফরেস্ট বাংলো, বহু ধর্মশালা ও সাধারণ মানের হোটেল ও থাকার জায়গা।
ভোজবাসা	২৮৭ (পায়ে-হাঁটা পথ)	ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস ও লালবাবা আশ্রম।
গোমুখ	২৯১ (পায়ে হাঁটা পথ)	থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। দরকারও হয় না।



প্রাসঙ্গিক তথ্য — ২

সঙ্গে কি নেবেন ?

- সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে যা বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ লটবহর বেশি নেবেন না। আগেকার দিনে অনেক জায়গায় অনেক কিছু পাওয়া যেত না, কিন্তু আজকাল প্রায় সব জায়গাতেই সব কিছু পাওয়া যায়।
- মালপত্র এমনভাবে ভাগাভাগি করে গোছাতে হবে, যাতে কোনো লাগেজই ভারী না হয়ে যায় এবং প্রয়োজনে নিজেরাই বইতে পারা যায়।
- মালপত্র গোছগাছ করার আগে লিস্ট করে নেবেন।
- বেশি গরম জামাকাপড় নিয়ে অযথা ভার বাড়াবেন না। একটা হাফ-হাতা-সোয়েটার, ফুলহাতা সোয়েটার/কোট, চাদর, মাফলার, মাঙ্কি ক্যাপ / স্কার্ফ এবং দস্তানা।
- হালকা বর্ষাতি, ফোল্ডিং ছাতা, টর্চ, দেশলাই-মোমবাতি, নাইলনের দড়ি, একটা তালা চাবি এবং অনেক ছোট বড় সেলোফিন ব্যাগ।
- ক্যানভাস জুতো (আমি গোমুখ গিয়েছিলাম কাবলি-চপ্পল পরে) স্লিপার ও বাড়তি এক জোড়া মোজা।
- প্রয়োজনীয় ওষুধ, জলশোধক ওষুধ এবং অবশ্যই আইডেনটিটি কার্ড।
- ক্যামেরা থাকলে বাড়তি ফিল্ম।
- জোগাড় করতে পারলে (সেটা কঠিন নয়) যেখানে বেড়াতে যাবেন সে অঞ্চলের ম্যাপ।
- ভ্রমণ-সংস্থার প্রযত্নে বেড়াতে গেলে নিজেদের আলাদা কোনো চিন্তা থাকে না। থাকার জায়গার জন্য চিন্তা করতে হয় না এবং ঘরোয়া খাবার পাওয়া যায়। কিন্তু খরচ বেশি। যদি হরিদ্বার / ঋষিকেশ থেকে সরকারী বাসে যান তাহলে আলাদা ব্যাপার, কিন্তু সে-যাত্রা খুব সুখের / আরামের হয় না।

আমি একাধিক জায়গায় বেড়াতে গিয়ে হিসাব করে দেখেছি, দলে যদি অন্তত চারজন থাকে, তাহলে ভ্রমণ সংস্থার প্রযত্নে না গিয়ে নিজেরা আলাদা গাড়ি ভাড়া করে নিলে আরামে ও মেজাজে যাওয়া যায় তো বটেই—খরচও কম হয়। অনেকেই এটা খেয়াল করেন না, কিন্তু এটি সাধারণ যোগ-বিয়োগের মতো সহজ অঙ্ক।

রওনা হওয়ার আগে অবশ্যই ফিরতি-সংরক্ষণ করে রাখবেন।

বেশ কিছু খুচরো টাকা/কয়েন সঙ্গে রাখা খুবই দরকার।

